MAHARSI MANSUR

OR

THE WONDERFUL LIFE OF MANSUR

HALLAZ,

A MOHAMEDAN SAINT.

BY

MOZAMMEL HUQUE.

মহর্ষি-মনসুর।

(ধর্ম্মবীর মহাত্মা মনসুর হাল্লাজের অপূর্ব্ব জীবনাখ্যায়িকা।)

শ্রীমোজাম্মেল হক্-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মূল্য ৷৵০ আনা।

Calcutta:

PRINTED BY ABINASH CHANDRA MANDAL

at the "Siddheswar Machine Press,"

13, Shibnarayan Dass's Lane.

1908.

বিজ্ঞাপন।

মুন্সী মোজাম্মেল হক্-প্রণীত—

১।	হজরত মোহাম্মদ (চরিতামৃত)	১৲
২।	মহর্ষি মন্সুর (সাধক-জীবনী)	॥৵০
৩।	ফেরদৌসী-চরিত	॥০
৪।	প্রেম-হার (হৃদয়-উন্মাদিনী কবিতামালা) ...	॥০
৫।	অপূর্ব্ব-দর্শন কাব্য (ঐতিহাসিক) ...	॥০
৬।	ইস্লাম-সঙ্গীত (সামাজিক)	৵০
৭।	জুবিলী-সঙ্গীত	/০
৮।	শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা (৮ম সংস্করণ) ...	/০
৯।	সাহিত্যশিক্ষা ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ) ...	৶০
১০।	পদ্যশিক্ষা ১ম ভাগ (৫ম ঐ) ...	৵০
১১।	পত্র ও দলিল-লিখন-শিক্ষা (২য় ঐ) ...	৵০
১২।	পদ্যশিক্ষা ২য় ভাগ (নীতিপূর্ণ) ...	।০
১৩।	তাপস-কাহিনী (২য় সংস্করণ)	যন্ত্রস্থ
১৪।	রঙ্গিলা বাই (উপন্যাস)	ঐ
১৫।	স্বজাতি-সঙ্গীত ...	ঐ

কলিকাতা—২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, ২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট নাথ কোং্র দোকানে এবং "শান্তিপুর—জেলা নদীয়া" ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট পাইবেন। বিদেশে ডাক-মাশুল খরচা দিতে হইবে।

সমালোচনা।

এডুকেশন গেজেট।—"মহর্ষি মন্সুর", এই পুস্তক খানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। ভাষা মার্জ্জিত বাঙ্গালা। আলোচ্য বিষয় হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর একটী সাধক বৈদান্তিকের জীবনী। এরূপ মহাত্মার পবিত্র চরিত্র পাঠে সকল জাতীয়েরই উপকার আছে।" ১৩০৩। ৬ই অগ্রহায়ণ।

বসুমতী।—ফেরদৌসী-চরিত। মহাকবি ফেরদৌসী সুপ্রসিদ্ধ পারস্য মহাকাব্য "শাহনামার" রচয়িতা, তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কাহার না আগ্রহ হয়? তাঁহার পর লেখক মহাশয় নিজে এক জন প্রতিভা-সম্পন্ন বাঙ্গালা কবিতা-লেখক। বর্ত্তমান পুস্তকে তিনি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গদ্যে কবির জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া অতীব পুলকিত হইয়াছি। মুসলমানের লিখিত এমন সুন্দর বাঙ্গালা পাঠ করা আমাদের ভাগ্যে অতি কমই হইয়া থাকে। কবিবর মোজাম্মেল হক্ মহাশয়ের লেখনী অমর হউক; তিনি নিজেব শক্তি-সামর্থ্য বঙ্গ ভাষার পুষ্টি-সাধনে নিযুক্ত করিয়া প্রকৃত সহৃদয়তার প্রমাণ দিয়াছেন।" ২৬ এ মাঘ, ১৩০৬ শাল।




উৎসর্গ-পত্র

১২৮৫ শালের ২৩শে আষাঢ় আমাদের পারিবারিক
এক অতি শোচনীয় স্মরণীয় দিন। সেই দিন,
জানি না কি অশুভ ক্ষণে আমার পূজনীয়
প্রতিপালক মাতামহ, আজন্ম বিশুদ্ধ-
চরিত্র, ন্যায়-নিষ্ঠা-সদাচারের
জ্বলন্ত মূর্ত্তি, সদা ধর্ম্ম-
নিরত পুণ্য-পুরুষ,

মোহাম্মদ বাদ্-উল্লা সাহেব,
(পীড়িত নহেন, সুস্থ শরীরে)
সহসা পরলোক গমন করেন।
সেই দিন এবং তাঁহার স্মরণ জন্য, পবিত্র
পুরুষের এই পবিত্র জীবনী-গ্রন্থ তাঁহার
পবিত্র নামে পরম ভক্তি ও
শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থকার
কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত
হইল।

নিবেদন—

অনেক দিন পূর্ব্বে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু নানারূপ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইহা তৎকালে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করি নাই। সম্প্রতি কয়েক জন গুণগ্রাহী বন্ধু ইহার হস্তলিপি দর্শনে মুদ্রাঙ্কনার্থ উপদেশ দেন। তাঁহাদের উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া আজ আমার পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম,—গ্রন্থ প্রচারিত হইল। কিন্তু অদৃষ্টে কি আছে, কে বলিতে পারে?

ইহা কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। এক খানি উর্দ্দু পুস্তিকার মর্ম্মাবলম্বনে অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য লইয়া স্বাধীন ভাবে রচিত হইয়াছে। সাময়িক রুচির অনুরোধে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও নূতন বর্ণনার সংযোগ করা গিয়াছে। বোধ করি, ইহাতে অন্যায় কিছুই হয় নাই। এক্ষণে এতদ্দ্বারা সেই সাধুকুল-শিরোমণি মহাত্মা হোসেন মনস্থরের পবিত্র নামের পাছে কোন অসম্ভ্রম হয়, ইহাই ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতেছি। আরও, গ্রন্থ মধ্যে কোন কোন স্থলে ধর্ম্মসম্বন্ধে দুই একটী কথার উল্লেখ আছে। যদি অজ্ঞানতা বশতঃ কুত্রাপি কোনরূপ দোষাশ্রয় ঘটিয়া থাকে, তবে দয়াময় জগদীশ্বর যেন এ দীন অজ্ঞানান্ধকে সে অপরাধ

ক্ষমা করেন, ইহাই সানুনয় প্রার্থনা। সহৃদয় ইস্‌লাম সমাজও বন্ধুভাবে উক্ত ত্রুটি পরিহারার্থ বা ইহার ভ্রমপ্রমাদ পরিবর্জ্জন ও উৎকর্ষ বিধানার্থ উপদেশ দিলে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিব। এক্ষণে দয়াময়ের কৃপায় ইহার উপর সাধারণের স্নেহদৃষ্টি পড়িলেই, আমার পরিশ্রম পুরস্কৃত হইল, বিবেচনা করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ইহা রচনা কালে শান্তিপুর জুবিলী মাদ্রাসার পারস্য-শিক্ষক জনাব মৌলবী হাজি অবায়েদুল্লা সাহেবের অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শান্তিপুর—নদীয়া।
১৩০৩ শাল, ৯ই আষাঢ়। } মোজাম্মেল হক্‌।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন—

কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "প্রায় কোনও মুসলমান লেখকের ভাগ্যাকাশে তাঁহার পুস্তকের সংস্করণ-চন্দ্রমার উদয় হইতে দেখা যায় না।" কথাটী যে সর্ব্বতো-ভাবে সত্য, তাহা আমার "মহর্ষি মনসুর" হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। কোথায় ১৩০৩ শাল, আর কোথায় ১৩১৫ শালের আরব্ধ কাল; এই দীর্ঘকাল পরে—প্রায় যুগাবসানে ইহার পুনঃ সংস্করণ! ইহা কি সংস্করণ বলিয়া মনে হইতে পারে? ফলতঃ এতদ্দ্বারা বঙ্গের মুসলমান সমাজের বিদ্যা-লোচনার অভাব, মুসলমানগণের বিদ্যা-শিক্ষায় ঘোর অনাস্থার বিষয়ই বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। হায় কবে বঙ্গের মুসলমানগণ বিদ্যার সমাদর করিতে শিখিবেন—কবে তাঁহা-দের ঘরে ঘরে পুস্তক-পত্রিকা পঠিত হইবে! বিধাতঃ! সে শুভ দিন কি আসিবে? আশা হইতেছে—আসিবে, বঙ্গবাসী মুসলমান ধীরে ধীরে শিক্ষা-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আজ তাহারই ফলে, জগৎস্রষ্টার ইচ্ছায় মহর্ষি মনসুরের দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, বলিতে হইতেছে। এ সংস্করণে মুদ্রাঙ্কন-কার্য্য যত্নের সহিত সুচারুরূপে সম্পা-দিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ইহার স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটী সম্পূর্ণ নূতন প্রস্তাব সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ সন্তোষ-লাভ করিলেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শান্তিপুর।
১৩১৫ শাল, জ্যৈষ্ঠ।

সাধারণের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী
গ্রন্থকার।

সূচিপত্র।

বর্ষণ, ফুলাঘাতে ক্রন্দন, নানা তত্ত্বকথা, বধ-মঞ্চে আরোহণ, আনাল্ হক্ উচ্চারণ, জড়-অজড় পদার্থ হইতে আনাল্ হক্ শব্দোত্থান, বধায়োজন, হস্তকর্ত্তন, রক্তাক্ত অজু, অন্যান্য অঙ্গচ্ছেদন, কোরাণের আয়েত উচ্চারণ, মস্তকচ্ছেদন, মাংসখণ্ড ও রক্তকণিকা হইতে আনাল্ হক্ শব্দোত্থান, সাধারণের ভীতি, অগ্নিতে অস্থি-মাংস নিক্ষেপ, অস্থ্যাদির অদগ্ধ হওন, তৎসমুদয় নদীতে নিক্ষেপ।

উপসংহার——জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবন, সাধারণের লাঞ্ছনা, উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গে মহর্ষির অঙ্গবাস নিক্ষেপ, চির-শান্তি।

মহর্ষি মন্সুর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মরুময় আরবের উত্তরাংশে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা ভুবনবিদিতা তুরস্কভূমি। তুরস্কের অগ্নিকোণস্থিত প্রদেশকে ইরাক-আরবি কহে। এই ইরাক-আরবির মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ সুরম্য বোগ্দাদ নগর অবস্থিত। বোগ্দাদের অতুলনীয় সুষমা-সমৃদ্ধি বর্ণনা করিয়া উঠে, কাহার সাধ্য? জগন্মান্য আব্বাস-বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা মাহাত্মা আবুজাফর মন্সুর ১৪৫ হিজরীতে এই নগর প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক এখানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং ইহার শ্রীবৃদ্ধি ও সৌষ্ঠবসাধনার্থ রাশি রাশি অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতে মস্জিদরাজি, মিনারশ্রেণী, তোরণমালা, বিদ্যালয়বাটী, প্রমোদ-কানন, রাজ-প্রাসাদ ও অপরাপর সৌধনিচয় নির্ম্মিত হওয়ায় ইহা সৌন্দর্য্য-মহিমায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করে।

মহানগর বোগ্‌দাদ প্রাকৃতিক দৃশ্য-শোভাতেও অতুলনীয়। ইহার চতুর্দ্দিকে শস্যশ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্র, অদূরে কল্লোলময়ী ফোরাৎ (ইউফ্রেটিস্) নদী প্রবাহিত, এবং নগরের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া নির্ম্মল-সলিলা তরঙ্গিনী দেজ্‌লা (তাইগ্রীস্) উভয় তীরস্থিত সৌধমালার পাদদেশ বিধৌত করিতে নিরত। সুতরাং ইহার সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধির ইয়ত্তা কোথায়? ফলতঃ বিধাতার কৃপায় পুণ্য-হস্ত-প্রতিষ্ঠিত এই পুণ্য-প্রভান্বিত আদর্শ নগর, কালে জ্ঞান-বিজ্ঞান সভ্যতাশিক্ষার কেন্দ্রভূমি, কত শত ধর্ম্মাত্মা "সুফী"-সাধুর লীলা-নিকেতন, এবং ন্যায়বিচারক বিচক্ষণ নরপতি ও অদীন-পরাক্রম বীরবৃন্দের সূতিকাগাররূপে পরিণত হইয়াছিল, ইহার নির্ম্মল যশঃ-সৌরভ ভূমণ্ডলের নরনারিগণকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

পূর্ব্বকালে এই ইস্‌লাম-গৌরব-গর্ব্বিত বোগ্‌দাদ নগরে এক অতি ধর্ম্মশীল, অগাধ ধীশক্তিসম্পন্ন, পরম পণ্ডিত ব্যক্তি বাস করিতেন। সত্যনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতা-গুণে নগরস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতি প্রদর্শন করিত। শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্ম-কর্ম্মসমূহ নিয়মিতরূপে প্রতিপালন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার পুণ্যহস্ত সাধ্যানুসারে দীন-দরিদ্রের অভাবমোচনে প্রশস্ত ও পরোপকারে উন্মুক্ত থাকিত। তিনি

ক্ষুধার্ত্তকে আহার, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় প্রদান ও নিঃসহায়কে সাহায্য করাই ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। প্রতিবাসীগণ তাঁহাকে সৌভাগ্যবান্ পুরুষ জানিয়া, চিরদিন তদীয় আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিত। ফলতঃ পরম-কারুণিক জগৎপিতা জগদীশ্বর, তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন; দয়াময়ের অনুগ্রহে তাঁহার কিছুরই অপ্রতুল ছিল না।

সহধর্ম্মিণী পূর্ণগর্ভা। সেই পতিব্রতা পুণ্যময়ী মহিলা তদবস্থার পালনীয় নিয়ম সকল প্রতিপালনপূর্ব্বক, অতি সন্তোষের সহিত গর্ভধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। অনন্তর যথাকালে শুভলগ্নে তাঁহার একটী সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত পরম-সুন্দর তনয়রত্ন জন্মগ্রহণ করিলেন।* পুত্রের সুবিমল শশধর-

* মহাত্মা হোসেন মন্‌সুর ঠিক কোন্ সময়ে জন্ম-পরিগ্রহ করেন, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে অবধারণ করা কঠিন ব্যাপার। তবে এইরূপ অনুমিত হয়, আমাদের মহামান্য পুণ্যপ্রাণ পয়গম্বর হজরত মহম্মদ মস্তফার (দং) আবির্ভাবের তিন শত বৎসর পরে অথবা হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী ধর্ম্মপ্রাণ তাপস শেখ আবুবকর শিবলী হিজরী ৩৩৪ শালে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। আবার গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে, হজরত ওস্‌মানের পুত্র ওমরের সহিত তাঁহার অসদ্ভাব ঘটায় তিনি মক্কাভূমি পরিত্যাগ করিয়া বোগ্‌দাদে প্রস্থান করেন। এই ওমর কোন্ সময়ের লোক এবং মন্‌সুর তাঁহার সম-সাময়িক কি না, বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহার মীমাংসা করিয়া লইবেন।

সন্নিভ কমনীয় কান্তিচ্ছটায় অন্তঃপুর প্রতিভাসিত—তদ্দর্শনে পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তানের শুভ কামনায় একান্তচিত্তে সর্ব্ব আনন্দদাতা বিশ্ব-বিধাতার উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় অবস্থানুযায়ী অর্থাদি বিতরণে দীন-দুঃখীদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিলেন। তাহারা পরিতুষ্ট হইয়া শিশুকে হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। গৃহ উল্লাসময়—আনন্দভরা! যেন স্বয়ং মূর্ত্তিমান আনন্দ আগমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। আজ যেন প্রচণ্ড তাপ দিনমণির কররাশি অধিকতর শুভ্র—অধিকতর উজ্জ্বল, অথচ শৈত্যগুণবিশিষ্ট। আবার সুশীতল মলয়-মারুত মৃদুমন্দপ্রবাহে চলাচলি করতঃ স্ফূর্ত্তি প্রচারে তৎপর হইল। পুরবাসীগণ এই শুভদিনে আনন্দে উৎফুল্ল-প্রাণ! প্রতিবাসী, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবেরাও সে উৎসবে যোগদান করিতে ত্রুটি করিল না! সকলেই আনন্দে উন্মত্ত। হাস্য-কোলাহলে গৃহভূমি শব্দায়মান হইয়া উঠিল।

বিধাতার কৃপায় এবং জন-সাধারণের আন্তরিক আশী-র্ব্বাদে এই ক্ষণজন্মা শিশু দিন দিন বর্দ্ধিত ও বলসম্পন্ন হইতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার অঙ্গপুষ্টি ও অপরূপ রূপলাবণ্য পরিস্ফুট হইতে লাগিল। পিতামাতা পরমযত্নে লালনপালন করিতে রহিলেন। আহা এ জগতে ভবিতব্যতার কথা কে

জানিতে পারে? যিনি ঐশী-শক্তি-প্রভাবে অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া জগতকে বিমোহিত ও বিস্মিত করিয়া গিয়াছেন, যে দৃঢ়ব্রত সত্যপ্রিয় মহাপুরুষ ধ্যানসমাধিতে নিমগ্ন হইয়া ধর্ম্মোন্মত্ততার চরমসীমায় সমুপস্থিত হইয়া অকাতরে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, যিনি তপস্বীকুলের মহাতেজস্বী সিংহস্বরূপ ছিলেন, যাঁহার অপার্থিব বৈচিত্র্যময় জীবনবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত, এবং হৃদয়মন বিস্ময়াপ্লুত ও কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, আজ এই সূতিকা-ক্ষেত্রে এই শিশুরূপে তিনি আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর পিতা যথাসময়ে শুভ দিন দৃষ্টে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, অতি সমারোহের সহিত শাস্ত্রসঙ্গত বিধানানুসারে শিশুকে হোসেন মন্সুর নামে আখ্যাত করিলেন।

হোসেন মন্সুর পরিশেষে যে এক জন ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি নামে প্রখ্যাত হইবেন, প্রথম হইতেই তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। জন্মদিবসে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কি যেন এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রতিভাসিত এবং প্রাণ-মনোমুগ্ধকর অপার্থিব সৌগন্ধে গৃহ আমোদিত হইতে থাকে ও তদীয় হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর-প্রীতির জ্বলন্ত নিদর্শনস্বরূপ এক মধুময় ভাব সঞ্চারিত হয়। হাস্যে, ক্রন্দনে, ক্রীড়নে ও

হস্তপদাদির সঞ্চালনে সেই ঐশিক প্রেম অভিব্যক্ত! দর্শক শিশুর ভাবভঙ্গি দেখিয়াই বিস্ময়াপন্ন ও অজ্ঞান! পিতামাতার আনন্দের অবধি নাই। আহা সে আনন্দ, সে স্বর্গীয় প্রফুল্লতা, ঈদৃশ ক্ষণজন্মা পুত্রের ভাগ্যবান্ পিতা ব্যতীত কি অপর কেহ অনুভব করিতে পারে?

এইরূপে দেখিতে দেখিতে ক্রমেই শিশুর জ্ঞানবিকাশ হইয়া, জিহ্বার জড়তা কাটিয়া গিয়া, মৃদু মধুর আধ আধ ভাষা দূরীভূত হইয়া বাক্যোচ্চারণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তখন পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার্থ, দেশের প্রথানুসারে বিজ্ঞ পিতা, মন্‌সুরকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। স্থিরধী মন্‌সুর আন্তরিক যত্ন ও প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে শিক্ষাগুণে যেমন তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইতে চলিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তদীয় অন্তরে ঈশ্বরপ্রীতি, গাম্ভীর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, সাধুতা ও ধর্ম্মচিন্তা ক্রমশঃ প্রবলরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি এমনি অসাধারণ প্রতিভাশালী, শান্তশীল ও স্মৃতিধর ছিলেন যে, সেই অনন্তদুষ্কর প্রজ্ঞাপ্রভাবে, দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই ধর্ম্মবিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বহুদর্শনেও তাঁহার ধর্ম্মপিপাসার উপশম হইল না।

ঔদাসীন্যের কি যেন এক গাঢ় কুহেলিকা—তত্ত্বানুসন্ধানের কি এক দৃঢ় আবরণ তাঁহার হৃদয়-ভূমি আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। তদীয় অনন্যদুষ্কর অধ্যবসায়প্রসূত যশঃসৌরভে জগৎ বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইল বটে, তিনি সাধারণ্যে সমাদৃত ও প্রিয়পাত্র-রূপে পরিগৃহীত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই ঔদাসীন্য-মেঘজাল অন্তর হইতে অপসারিত হইল না, প্রবল ধর্ম্মপিপাসার শান্তি হইল না, আন্তরিক বাসনা চরিতার্থ হইল না, নিরন্তর কেবল স্বীয় মনোমত এক জন উপযুক্ত দীক্ষাগুরুর জন্য চিন্তান্বিত রহিতেন। শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ যথারীতি বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করেন, আর কোথা গেলে কিরূপে অভিলষণীয় দীক্ষাগুরু পাইব, এই চিন্তাতেই দিনযামিনী ম্রিয়মাণভাবে ক্ষেপণ করেন। ভাবনার ভয়ানক কালিমা-রেখা তাঁহার বিস্তৃত ললাটফলকে নিয়ত পরিদৃশ্যমান থাকিত, সর্ব্বদাই অধোভাগে দৃষ্টি সংযোগ করিয়া কুঞ্চিতনেত্রে কি ভাবিতেন এবং স্বেচ্ছামত স্থানে স্থানে ধর্ম্মমন্দিরে গমনাগমন পূর্ব্বক আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টায় ফিরিতেন। শুভ্রকর্ম্মা মন্সুর এইরূপে ক্ষুব্ধচিত্তে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এ জগতে মঙ্গলময় জগদীশ্বর কাহারও মনোভিলাষ অসংপূর্ণ রাখেন না। তিনি ক্ষুধার্ত্তকে উপাদেয় আহার, তৃষ্ণাতুরকে সুশীতল বারি, অর্থপ্রার্থীকে বিপুল বিভব,

ভোগবিলাসীকে ব্যসনসামগ্রী ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের অভিলষিত দ্রব্যাদি দানে পরিতুষ্ট করেন। তিনি প্রার্থনাপূরণকারী, একমাত্র দাতা ও পরম দয়ালু। সুতরাং মনসুরেরও যে এই বাসনা পূর্ণ করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? সৌভাগ্যক্রমে বোগদোদ নগরেই পবিত্র সৈয়দ-বংশোদ্ভব খাজা জুনেদ শাহ নামে এক অদ্বিতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পরম পণ্ডিত বাস করিতেন। তৎকালে তাঁহার সদৃশ তত্ত্বদর্শী সিদ্ধ পুরুষ আর কেহই ছিল না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্মের অতি গভীর গূঢ় বিষয় সমুদয় তাঁহার নিকট নখদর্পণের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। তাঁহার শিষ্যশাখাও নিতান্ত কম ছিল না। তিনি নিয়ত তৎসমুদয়ে পরিবৃত হইয়া মহানন্দে শাস্ত্রচর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

মনসুর, মহাজ্ঞানী সৈয়দ জুনেদ শাহের গুণগ্রামের কথা অবগত হইয়া, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে তৎসমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অতঃপর সময়ানুসারে অতি নম্রভাবে সৈয়দ সাহেবের নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলে, সেই মহিমান্বিত মহাপুরুষ মনসুরের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়া কহিলেন,—"ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে অবস্থান করিলে করুণাময় জগৎস্রষ্টার কৃপায় তোমার বাসনা সফল হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই।"

এতৎ অনুকূল বাক্য শ্রবণে মনসুরের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সর্ব্বসিদ্ধিকর্ত্তা নিখিলনাথকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, প্রফুল্লচিত্তে দিবারজনী গুরু-পদসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কিছু দিবস অতীত হইয়া গেল। মনসুরের ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগ, প্রগাঢ় গুরুভক্তি, চিন্তহারী বিনয়নম্রতা এবং অচলা সহিষ্ণুতা দর্শনে সৈয়দ সাহেব নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার এতাদৃশ অসহ্য পরিশ্রমের পারিতোষিক প্রদান মানসে এক দিবস কৃপাবলোকনে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "মনসুর! আমি তোমার ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার অধ্যবসায়, তোমার গুরুভক্তি, তোমার শিক্ষানুরাগ, তোমার চরিত্র-বল, তোমার আলাপ-সম্ভাষণ—সকলই মধুর, প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য। তোমার হৃদয়-ভাব অতি উচ্চ ও মহান্। পরিশ্রমের অবশ্যই পুরস্কার আছে। অতএব যাও, অবগাহন করিয়া আইস, অদ্য তোমাকে কিছু ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিব।" শান্তশীল মনসুর হৃষ্টচিত্তে মস্তক অবনত করিয়া, যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং ঈশ্বরানুগ্রহে অদ্য আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল বলিয়া অবিলম্বে স্নানকার্য্য সমাপনান্তে শুদ্ধচিত্তে হস্তপদাদি প্রক্ষালন (অজু) পূর্ব্বক অঙ্গশুদ্ধি করতঃ পবিত্রভাবে পূজ্যপাদ গুরুর সম্মুখীন হইলেন। তখন মহানুভাব সৈয়দ সাহেব শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থানুসারে

মনসুরকে প্রথমতঃ "তওবা" * করাইয়া লইলেন। পরে ইহ-পরকালের কঠোর যন্ত্রণার পরিত্রাণ-পথ প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে একে একে তন্ন তন্ন করিয়া ধর্ম্মের যাবতীয় সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। সাধু সমাজের স্পৃহণীয় গুপ্ততত্ত্বের এরূপ বিশদ ব্যাখ্যা করিলেন যে, তাহাতে যেন মহান্‌শক্তি জগৎস্রষ্টার পবিত্র সত্তা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন। ফলতঃ বীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ ফলপ্রদ হয়, মনসুরের পক্ষে এই গুরূপদেশও তদ্রূপ ফলোপধায়ক ও শুভজনক হইল; তিনি একাগ্রমনে তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। এইরূপে প্রসন্নচিত্তে আন্তরিক যত্ন ও স্নেহের সহিত হৃদয় খুলিয়া সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়াতে হোসেন মনসুরের অন্তরাকাশ পরিষ্কৃত ও জ্ঞান-নেত্র বিকশিত হইল। তাঁহার সেই হৃদয়াধিকৃত তিমিরজাল অলক্ষ্যে অন্তর্হিত হইল; যেন কোন মোহনীয় মন্ত্রপ্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে কি এক অলৌকিক অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল। মনসুর নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন। একে তিনি স্বতঃই অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে আবার গুরুদত্ত শিক্ষাবল

* তওবা—অনুশোচনা বা কৃতাপরাধের জন্য জগৎস্রষ্টার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা এবং পুনর্ব্বার তাহা না করণের দৃঢ়তা।

পাইয়া তাঁহার সেই স্বাভাবিক প্রতিভা অধিকতর তেজস্বিনী হইয়া উঠিল; তিনি ঐশিক-প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া একেবারে উন্মত্তবৎ হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদ্যাবিশারদ গভীর-তত্ত্বজ্ঞ সাধুকুল-শ্রেষ্ঠ সৈয়দ খাজা জুনেদ শাহ কর্ত্তৃক দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, হোসেন মনসুরের ঈশ্বরানুরাগ ও জ্ঞানান্বেষণ-বাসনা অত্যধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইল। তাহার চিত্তভূমি প্লাবিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিদ্যুল্লহরী আবির্ভূত হইতে লাগিল। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হওয়াতে তিনি নশ্বর জগতের মোহময় মায়াজাল ছিন্ন করিয়া আপনাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, অথবা আমি এ মর-জগতের কিছুই নহি বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হইতে লাগিল। ফলতঃ অচিরকাল মধ্যে তিনি দেশ মধ্যে এক জন পরম তত্ত্বদর্শী ভাবুক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। সমগ্র খ্যাতনামা পণ্ডিত ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি মনসুরের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও অচিন্তনীয় কার্য্যকলাপ দৃষ্টে বিস্মিত হইয়া নীরবে মস্তক অবনত করিলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া, সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। শিক্ষার্থীর সংখ্যাও, নিতান্ত কম হইল না। অবিনশ্বর ধন পরমতত্ত্ব অবগত হইবার বাসনায় বহুসংখ্যক লোকের নিত্য সমাগম হইতে লাগিল;

অনেকে অহর্নিশ তদীয় পদ-সেবায় নিযুক্ত! কিন্তু তিনি নিরন্তর নেত্র-যুগ নিমীলন করিয়া স্থিরচিত্তে বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া, কি এক গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। সে যে কি চিন্তা, তাহা তিনি কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে কেবল সেই একটী বিষয় ব্যতীত অপর কিছুই স্থানলাভ করিতে পারিত না। দিবসে আহারে ব্যস্ত নহেন, নিশিতে নিদ্রা বা বিশ্রাম নাই, শুদ্ধ অবিশ্রান্ত জাগ্রদবস্থায় স্তব্ধভাবে কি যে যোগসাধনে নিরত থাকিতেন, তাহা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী ভাবুক ব্যতীত অপর সাধারণে বুঝিতে অক্ষম।

এই সময়ে মহর্ষি সাধু-সহবাসে অধিকতর অভিজ্ঞতালাভের কামনায় দেশ-পর্য্যটনের বাসনা করেন। তদনুসারে তিনি তস্তরে আগমন করিয়া, সাধুপ্রবর আবদুল্লা তস্তরীর সহবাসে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তৎপরে বস্‌রা, মক্কা, খোরাসান, শিস্তান, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু দেশ ও বহু নগর পরিভ্রমণ করিয়া, বহু সাধু লোককে সন্দর্শন করেন*। আমরা এস্থলে তাঁহার সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কয়েকটী অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

তপোধন বহুবার পবিত্র মক্কাভূমি পরিদর্শন ও তথায় অবস্থিতি করিয়া শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন

* বিশেষ বিবরণ "তাজকেরাতল আউলিয়া" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

করেন। একদা তিনি উক্ত পুণ্যস্থানে স্বীয় ধৈর্য্যশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি সুবিখ্যাত বায়তোল্লা অর্থাৎ ধর্ম্মমন্দির কাবা মস্‌জিদের সম্মুখভাগে সমস্ত দিবস প্রচণ্ড সৌর-রশ্মি-তলে অকাতরে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। শরীরে আচ্ছাদন মাত্র দিতেন না, প্রখর সূর্য্যের অগ্নিকণা সদৃশ অসহ্য কর-প্রভাবে গাত্র বহিয়া অজস্রধারে স্বেদ-ধারা বিগলিত হইয়া ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত করিয়া ফেলিত, এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ কাষ্ঠ-খণ্ডের ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। কষ্টের অবধি ছিল না; কিন্তু তাহাতেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হন নাই। বদনমণ্ডল প্রফুল্ল, চিত্ত বিকাররহিত ও উচ্চশির গিরি সদৃশ অদম্য, অচল ও অটল; মুখে আহ্ শব্দটীও বহির্গত হইত না। দিবানিশি কেবল প্রস্তর-প্রতিমাবৎ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। সেই সময়ে এক খণ্ড রুটীর সামান্য অংশ মাত্র তাঁহার দৈনিক আহার ছিল। এইরূপ কঠোর তপস্যায় মহাতপা মন্সুর পূর্ণ এক বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। কি অবিচলিত ভীষণ অধ্যবসায়! ভাবিয়া দেখিলেও মস্তক বিঘূর্ণিত ও সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠে। এরূপ সহিষ্ণুতা প্রকৃত সাধক ব্যতীত অপরে কখনই সম্ভবপর নহে।

মহর্ষি মক্কা অবস্থানকালে একদা আরাফাতের প্রান্তরে প্রার্থনা করিতে গমন করেন। তথায় প্রার্থনাকালে বলেন, "হে করুণাময় জগৎপতে! হে বিশ্বপ্রাণ! হে প্রেমময় দীনবন্ধো! আমার কার্য্যকলাপের দ্বারা জগৎ যদি আমাকে মহাপাপী ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়াই পরিগণিত করিয়া থাকেন, তবে হে দয়াময়! আমাকে এই অবস্থাতেই উন্নতি করিতে শক্তি দিউন।" এইরূপ বলিতে বলিতে সহসা তাঁহার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি লোক দেখিতে পাইলেন; অমনি তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল,—কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন; নিকটে একটী বালুকাস্তূপ ছিল, ত্রস্তভাবে তাহারই অন্তরালে যাইয়া আত্মগোপন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন তিনি দেখিলেন, প্রান্তর জনশূন্য হইয়াছে, প্রকৃতি নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে, দৃষ্টিসীমার মধ্যে মানবের চিহ্নমাত্র নাই, তখন তিনি বহির্গত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে, কাতরকণ্ঠে অবিশ্রান্ত প্রার্থনায় নিরত হইলেন।

ঋষিবর কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। সংসার-আবিল্য-জাল হইতে পৃথক থাকিয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যান-ধারণা করাই যে তাঁহার এই নির্জ্জন-নিবাসের প্রধান কারণ, তাহাতে আর সংশয় নাই। তৎপরে তিনি পারস্য রাজ্যে গমন করেন। তথায় অবস্থিতিকালে মহর্ষি কয়েকখানি তত্ত্বোপ-

দেশপূর্ণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় এরূপ গভীর গবেষণা-প্রসূত যে, অনেকানেক জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতের বহুদর্শনকেও তাহাতে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতঃপর তিনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে বহুসংখ্যক যাত্রিক সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার পুণ্য-ক্ষেত্র মক্কায় আসিয়া উপনীত হন। এবার তিনি মক্কায় অধিক দিন অবস্থান করেন নাই। কারণ, এক জন নষ্টবুদ্ধি দুরন্ত লোক তাঁহাকে যাদুকর ভণ্ড-যোগী বলিয়া দুর্নাম রটনা করে। তজ্জন্য তিনি ক্ষুণ্ণমনে মক্কাতীর্থ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাপসরাজ সুদূরবর্ত্তী ভারতবর্ষে * আসিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন, ধর্ম্মভ্রান্ত ভারতের অসার পৌত্তলিকতা অধর্ম্ম অপনোদন করিয়া তৎস্থলে যথার্থ ও জগদীশ্বরের মনোনীত নিরাকার একেশ্বরবাদ-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিব,—অধিবাসীদিগকে সদুপদেশ প্রদানে সত্য-পথে আনয়ন করিব। কিন্তু তাঁহার সেই আশা কতদূর ফলবতী হইয়াছিল, তাহা অবধারণ করা যায় না। ফলতঃ এইরূপে তিনি বহু স্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক লোকদিগকে বিবিধ প্রকারে

* ঋষিরাজ ভারতের কোন্ প্রদেশে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করিয়াছিলেন, কত দিন ছিলেন এবং কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই।

সৎশিক্ষা প্রদান ও বহু সাধু-সহবাস করেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, কুত্রাপি সুনাম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ মহর্ষি যেরূপভাবে তত্ত্বকথা বলিতেন, অল্পবুদ্ধি লোকেরা তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অপবাদ রটনা করিত; এমন কি, অনেকে প্রকাশ্যে তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার বীর-হৃদয় অচল অটল,—দমিত হইবার নহে, তাহাতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও নিরুৎসাহিত বা ভগ্নোদ্যম হইতেন না, স্থিরমনে স্বীয় গন্তব্য পথের অনুসরণ করিতেন।

তপোধন, বহু দিবস নানাদিগ্‌দেশ পর্য্যটনের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। জন্মভূমি বোগ্‌দাদে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মোন্মত্ততা চরম সীমায় সমুপস্থিত হয়। কথিত আছে, একদা তিনি স্বকায় দীক্ষাগুরু তপস্বিকুলভূষণ খাজা সৈয়দ জুনেদ শাহকে কোন প্রশ্ন করেন। সৈয়দ সাহেব তদুত্তরে বলেন, "মন্‌সুর! সাবধান, রসনাকে শাসনে রাখিও। নতুবা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, কোন্ দিন তুমি শূলাগ্রে আত্ম-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বধ্যভূমি অনুরঞ্জিত করিবে।" প্রশ্নের উত্তরে এই কঠিন কথা শুনিয়া স্পষ্টবাদী নির্ভীক মনসুর খাজা জুনেদ শাহ্‌কে নিরুত্তর করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সাধকপ্রবর নির্জ্জনে যোগসাধনে উপবেশন

করিলেন ; আহার, বিহার, বিশ্রাম, নিদ্রা প্রভৃতি মানব-স্বভাব-সুলভ যাবতীয় ইন্দ্রিয়-সম্পর্কীয় কার্য্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন রহিলেন। কেবল সেই একই ভাব, সেই ফল্গু-নদীর অন্তঃ-প্রবাহ, সেই বাহ্য-জ্ঞানশূন্যতা, সেই ধ্যান-স্তিমিত নেত্র! নীরব ও নিস্পন্দ! মশক-মক্ষিকাদির উপবেশনে দূরে থাক, দংশনেও গাত্র স্পন্দিত হইত না। এই অবস্থায় দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিন, দুই দিন করিয়া ক্রমে সপ্তাহ, সপ্তাহের পর পক্ষ, পক্ষের পর মাস, মাসের পর বৎসর, এইরূপে কত দিন, কত সপ্তাহ, কত পক্ষ, কত মাস, কত বৎসর চলিয়া গিয়া, অনন্ত কালের গভীর গর্ভে বিলয়-প্রাপ্ত হইল, জগতের কত স্থানে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, কত মানবের ভাগ্য-চক্রের ঘূর্ণনে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিল, কিন্তু মন্সুরের এই ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল না, স্বভাবের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ নিরন্তর নিরাময় নিখিলনাথের ধ্যান-ধারণায় নিবিষ্ট ;—সাধন-সমুদ্রের অন্তস্তলে নিমজ্জিত হইয়া নির্জ্জীব জড়পিণ্ডের ন্যায় নিশ্চল রহিতেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে শত সহস্র আনন্দোৎসব, সুমধুর বাদ্যভাণ্ড, বা কোনরূপ ভীষণ অনিষ্টপাত হইলেও তদীয় চিরায়ত্ত চক্ষু-কর্ণ ভ্রমেও তদনুসরণে ধাবিত হইত না। ফলতঃ তিনি সংসার-আবলা-জাল হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া, মায়া-মোহ-

বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্য-অন্তঃকরণে ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন। সে প্রেমের মর্ম্ম কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু আগ্নেয়গিরির গহ্বরাভ্যন্তরে অনলরাশি পরিপূর্ণ হইলে, উদ্গীরণ না করিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারে? পাত্র পূর্ণ হইলে বারি স্বতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আহা! এক দিবস অকৃত্রিম ভক্ত প্রেমোন্মত্ত মন্সুর প্রেমের পূর্ণ আবেশে অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন—"আনাল হক্" (অহং ব্রহ্ম বা আমিই ঈশ্বর)! উঃ কি ভীষণ অধর্ম্মের কথা! কি পাপের কথা!! কি স্পর্দ্ধাজনক অন্যায় উক্তি!! রক্তমাংসময় নশ্বর মানবে—ইন্দ্রিয়ের অঙ্গুলি সঙ্কেতে চালিত দুর্ব্বল মানবে—জলবিম্ববৎ ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র মানবে ঈশ্বরত্বের অধিকার!! গোষ্পদে গভীর বারিনিধির আরোপ!!! ইহা কি উন্মত্তের প্রলাপ নহে? ভক্তের কি এই উক্তি? কখনই নহে। সকলে ইহা শুনিয়া বিস্মিত ও চকিত হইয়া হতবুদ্ধির ন্যায় চাহিয়া রহিল। এদিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে এ সংবাদ নগরময় প্রচারিত হইতে আর বাকি রহিল না। যে শুনে সেই স্তম্ভিত, সেই হতচৈতন্য। নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। বোগদাদের আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্ব সমাজেই এই একই কথা—একই বিষয়ের আন্দোলন! কেহ কেহ, হায় ধর্ম্মপ্রাণ মন্সুর পাগল হইয়াছেন বলিয়া শোক প্রকাশ

করিতে লাগিল। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়গণ মন্সুরের সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ভাই! তোমার মনে এ বিকৃতি জন্মিল কেন? তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছ? তুমি এক জন পরমজ্ঞানী, তোমাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমাদের অনধিকার-চর্চ্চা ও ধৃষ্টতামাত্র! তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতেছি, সাবধান, সাবধান। জান ত, এ ধর্ম্মবিগর্হিত নিদারুণ পাপকথা। একথা পুনর্ব্বার উচ্চারিত হইলে তোমার সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। এমন কি, ইহাতে তোমার জীবনের আশা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। অতএব স্থির হও, যাহাতে এই কুচিন্তা অন্তর হইতে অন্তরিত হয়, এবং চিত্ত প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক ও সচেষ্ট হও। এ উক্তি তোমার পক্ষে, তোমার কেন, জগতের কোন লোকের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। তাই পুনর্ব্বার বলিতেছি, তুমি আপনাকে জগতের শত্রু করিও না, "চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন কর।" ইত্যাকার কতই প্রবোধ-ব্যবস্থার প্রয়োগ করা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উত্থিতফণা ফণী মন্ত্রৌষধ গ্রাহ্য করিল না! এ মন্ত্রে কোনও ফলোদয় হইল না,—সকলই অসাধ্য ও ব্যর্থ হইল। প্রেমমুগ্ধ মন্সুর এ সান্ত্বনা-বাক্যে ভুলিলেন না। প্রবহমানা স্রোতস্বতীর দিগন্তগ্রাসী প্রবল প্রবাহ রোধ করে, কাহার সাধ্য? তিনি নরলোক-দুর্লভ শান্তি-

সুধাপ্রদ প্রেম-পারাবারের গভীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া আছেন, লোকের নিষেধ-বাক্যে সেই চিরসুখের স্থান কি পরিত্যাগ করিতে পারেন? সুখময় সরলপথ ছাড়িয়া কোন্ ব্যক্তি কণ্টকাকীর্ণ পথে পদার্পণ করে? শত যত্নেও মন্‌সুরের মানসিক গতি আর ফিরিল না; সুহৃদ্বর্গের উপদেশ উপেক্ষিত হইল। তিনি উপহাসব্যঞ্জক উচ্চ হাস্য করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "আমার আবার জীবনের আশা কিসের? আমার কি জীবন আছে? আমি ত ইতিপূর্ব্বেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমি যে মৃত! মৃতের কি পার্থিব ভয় বা জ্বালাযন্ত্রণা আছে? না কখন হইতে পারে? অথবা যদি জীবন থাকে, তবে তাহা ত অতি তুচ্ছ পদার্থ! যাহা এই আছে, পর মুহূর্ত্তে নাই, সে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের মূল্যই বা কত? সামান্য কাচখণ্ডের বিনিময়েও ত তাহা ক্রয় করিতে পারা যায় না। সেই অকিঞ্চিৎকর পদার্থের জন্য আবার ভয় কি? তাহার মমতা যত্নই বা কি জন্য?" ইহাই বলিয়া ধর্ম্ম-মদমত্ত মন্‌সুর ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ "আনাল হক্" স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহর্ষি মনসুরের ধর্ম্মোন্মত্ততার বিষয় পুস্তকান্তরে অন্যরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের পাঠকগণের অবগতির জন্য সেই কৌতুকাবহ ঘটনাটীও এস্থলে গৃহীত হইল।

ইহা ভারতীয় সাধকবৃন্দের শিরোভূষণ ও তত্ত্ব-জ্ঞানের সমুজ্জ্বল সূর্য্য স্বরূপ মহিমার্ণব সিদ্ধ পুরুষ হজরত খাজা কোতব-উদ্দীন বক্তিয়ার কাকী সাহেবের কথা; সুতরাং মূল্যবান্ ও সারগর্ভ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি এক তাপস-সভায় নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্বের প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ প্রকাশ করেন যে, মহর্ষি হোসেন মনসুরের এক ধর্ম্মপরায়ণা জ্যেষ্ঠা সহোদরা ছিলেন। তিনি নির্জ্জনে অনন্যমনে যোগ-সাধনের নিমিত্ত নিত্য নিশীথ সময়ে নগরবহির্ভাগে এক নিবিড় অরণ্যে গমন করিতেন এবং যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে নিরাময় নিখিলনাথের ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হইতেন। ইহাই তাঁহার তপস্যার নিয়ম ছিল। উপাসনান্তে যখন তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইত, তখন দৈব আজ্ঞাক্রমে নিয়োজিত এক স্বর্গীয় দূত সুনির্ম্মল সুস্নিগ্ধ ঐশিক প্রেমামৃত-পূর্ণ এক সুদৃশ্য পানপাত্র হস্তে লইয়া তথায় শুভাগমন

করিতেন এবং পুণ্যবতী রমণীকে অভিবাদনপূর্ব্বক অর্পণ করিতেন। তিনি হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক পাত্র গ্রহণ করিয়া, প্রফুল্লবদনে সেই দিব্য সুধা পান করতঃ গৃহাভিমুখিনী হইতেন।

এই গোপনীয় ঘটনার আভাসমাত্র কোনক্রমে মন্‌সুরের কর্ণগোচর হয়। প্রতিদিন নিশীথ সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া ভগিনী গুপ্তভাবে কোথায় গমন করেন? তপস্যার জন্য? অথবা কি কারণে? এ রহস্য অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহার অন্তরে অতীব ঔৎসুক্য ও উদ্বিগ্ন জন্মিল। তিনি নিদ্রিতের ভাণে জাগরিত থাকিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত সতৃষ্ণ-নয়নে ভগিনীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর একদা সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার ভগিনী নিয়মিত সময়ে সকলের অজ্ঞাতসারে গাত্রোত্থান করিয়া নিস্তব্ধভাবে গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলেন। অমনি মন্‌সুরও গুপ্তভাবে নিঃশব্দ পদক্ষেপে অতি সন্তর্পণে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

অগ্রে ভগিনী, পশ্চাৎ ভ্রাতা—উভয়ে নিশার নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া চলিতেছেন, কেহ কাহার গোচরীভূত হইতেছেন না। ক্রমে নগরের নভস্পর্শী অট্টালিকারাজি ও এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া একটী নিবিড় অরণ্যের সম্মুখে

উপস্থিত। কুত্রাপি জনপ্রাণী নাই, প্রকৃতি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া শান্তিসুখে বিশ্রাম করিতেছেন, আকাশে আজ চন্দ্র অদৃশ্য; কিন্তু লক্ষ লক্ষ তারকা প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় আপনাদের ক্ষীণ রজতরশ্মি বিতরণ করিয়া নৈশ তমিস্রের তরলতা সম্পাদন করিয়াছে। এহেন সময়ে এই দুর্গম স্থানে সরলা কুলমহিলা একাকিনী—এক দিন নহে, প্রত্যহ একাকিনী আগমন করেন। কি ভয়ানক কার্য্য, ইহা প্রকৃতই দুঃসাহসের কার্য্য। অন্তঃপুরবাসিনী কোমলহৃদয়া কুলাঙ্গনার স্বভাবে একার্য্য কথনই শোভা পায় না। মন্‌সুর চিন্তাকুলচিত্তে ইহাই ভাবিতেছেন। তাঁহার ভগিনী কিন্তু স্বীয় কার্য্যে অগ্রসর; তিনি বৃক্ষশ্রেণী-সমাকীর্ণ এক সংকীর্ণ পথ দিয়া অরণ্যের অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ করিলেন এবং এক বৃক্ষতলে লতাপল্লব-রচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

স্থানটী অতি মনোরম! চতুর্দ্দিকে ঘন সন্নিবেশিত তরুগুল্ম প্রাকৃতিক প্রাচীররূপে বিরাজিত, মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ বিটপী ঘনপল্লববিশিষ্ট শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান; বৃক্ষের নিম্নভাগ সমতল—সুন্দর—পরিষ্কৃত—পরিচ্ছন্ন! যেন মুর্ত্তিমতী পবিত্রতা ও স্বর্গীয় মাধুর্য্যে স্থানটী পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ ইহা সাধনার উপযুক্ত

আশ্রম বটে। এখানে আসিয়া মন্‌সুরের ভক্তিনদী স্বতঃই উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে মহিমাময় মহীশ্বরের উদ্দেশে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিলেন এবং ধর্ম্মশীলা ভগিনীকে শত শত ধন্যবাদ প্রদানানন্তর তাঁহার শেষ কার্য্যকলাপ দর্শনেচ্ছায় কিঞ্চিৎ দূরে লতাগুল্মের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ভাবে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

তপস্বিনী তপোমগ্না—বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা। তিনি বিশ্ব-বিধাতার ধ্যান-ধারণায় দেহপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। নীরব—নিস্পন্দ! যেন প্রস্তর-প্রতিমার ন্যায় যোগোপবিষ্টা। এ যোগ শত বজ্রপাতেও ভঙ্গ হইবার নহে। আহা কি অলৌকিক—কি অনির্ব্বচনীয় তপশ্চারণ। ধন্যা রমণী!! ধন্য তাঁহার হৃদয়-বল!! তখন মন্‌সুর বুঝিলেন, তাঁহার ভগিনী সামান্যা রমণী নহেন।

এই অবস্থায় যামিনীর যামত্রয় অলক্ষ্যে অতিবাহিত হইয়া গেল। রমণী যথাকালে কঠোর সাধন-সমাধি ভঙ্গ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইবামাত্র সহসা কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল; পরক্ষণেই এক শুভ্রকান্তি দেব-দূতের আবির্ভাব! দূতবরের হস্তে পানপাত্র—উজ্জ্বল অমিয়পূর্ণ; তাহা হইতে সুরম্য সৌরভ মনোপ্রাণ মাতাইয়া বহির্গত হইতেছে। শুদ্ধচারিণী সুশীলা

মহিলা অতি যত্নে পাত্র গ্রহণানন্তর ভক্তি-গদ্‌গদচিত্তে তাহাতে শ্রীমুখ সংযুক্ত করিয়া পান করিতে আরম্ভ করিলেন। মনস্বী মন্‌সুর অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত দেখিতেছেন; দেখিয়া বুঝিলেন, পাত্রস্থ পানীয় অপার্থিব, দৈব-প্রেরিত ও দৈবগুণ-সম্পন্ন, সন্দেহ নাই। যাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, যে অস্থি-মাংস-মজ্জা-রক্ত-গঠিত মানব ন্যায়-নিষ্ঠাসদাচার-বলে বলীয়ান্, স্বয়ং করুণাময় বিশ্বপতি যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট; তিনিই এই দেবদুর্লভ পবিত্র স্বর্গামৃত পানের অধিকারী! আহা পুণ্যকর্ম্মফলে যখন আমার স্নেহময়ী ভগিনী সেই অমৃত-ভাণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পান করিতেছেন এবং ভাগ্যক্রমে আমিও নিকটে উপস্থিত আছি, তখন আমার ঐ জগৎলোভন অমূল্য পদার্থের অংশ গ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এ শুভ সুযোগ পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। ইহাই স্থির করিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে বিনয়-নম্রতার সহিত "ভগিনি! ক্ষান্ত হউন, সমুদয় পান করিবেন না, আমাকে কিঞ্চিৎ দিবেন" ইত্যাদি বলিতে বলিতে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন।

অকস্মাৎ এ কাহার কণ্ঠস্বর! কে এ গভীর নিশিতে এ নির্জ্জন বনপ্রদেশে আসিল? রমণী চকিত ও বিস্মিত হইয়া পান-পাত্র হইতে মুখ তুলিয়া ফিরিয়া দেখেন, মন্‌সুর। মন্‌সুর! কিরূপে কখন্ এখানে আসিল মন্‌সুর!! কেমনে সে এ সংবাদ

জানিতে পারিল! হায় হায়, তবে ত সে আমার গুপ্তসাধন-ক্রিয়া সমস্তই জানিতে পারিয়াছে! সাধের ষড়যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! অহো অদৃষ্ট! এত দিনে আমার সমুদয় পরিশ্রমই পণ্ড হইল!! পুণ্যময়ী রমণী অশ্রুপূর্ণ-নয়নে ঈদৃশী অনুশোচনার সহিত ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "মন্সুর! আসিয়াছ? উত্তম। পান করিবে, কর। কিন্তু ভাই! এ পানীয়ের জ্বালাময় প্রভাব তোমার ক্ষুদ্র প্রাণ সহ্য করিতে পারিবে না"। মন্সুর এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া ব্যগ্রতার সহিত হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক পান-পাত্র গ্রহণ করিলেন, এবং ভগিনীর পানাবশিষ্ট যে অতি সামান্য পানীয় ছিল, তাহাই ভক্তিভাবে ব্যস্ততার সহিত পান করিলেন। কি আশ্চর্য্য!! পরক্ষণেই ভগিনীর ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইল। পান করিয়াই মন্সুর উদ্‌ভ্রান্ত—বিভোর—আত্মহারা হইলেন; এবং বিস্ফারিত-লোচনে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন "আনাল হক্।"

চুপ্, চুপ্, চুপ্—মন্সুর স্থির হও; তোমার কি হিতাহিত জ্ঞান নাই!! ও কথা মুখাগ্রে আর আনিও না। কিন্তু হায়, এ অনুযোগ অনুরোধ কোনও ফলোপধায়ক হইল না। তদ্দর্শনে চারুশীলা তপস্বিনী বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় হা-হুতাশ ছাড়িয়া ব্যথিত-হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

মন্সুরকে কহিলেন, "রে অবোধ! রে সংকীর্ণচেতা! আমি কি বলি নাই, তুমি এ তেজঃ সহ্য করিতে পারিবে না! তুমি যে কেবল আমার ধর্ম্মব্রত পালনের পথে কণ্টক স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইলে, তাহা নহে, আমার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য নষ্ট করিলে। আরও আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুমি অতঃপর আত্মসম্মান নষ্ট করিবে, কলঙ্কিত হইবে এবং আমাকেও সেই কলঙ্কের অংশ-ভাগিনী করিবে।" ইহাই বলিয়া সেই তেজস্বিনী রমণী চঞ্চল চরণে আলয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দেবদূত ইত্যগ্রেই অদৃশ্য হইয়াছিলেন। মন্সুর উন্মত্ত! সেই অবস্থায় "আনাল হক্" বলিতে বলিতে প্রত্যূষসময়ে জনাকীর্ণ মহানগর বোগ্দাদে প্রবিষ্ট হইলেন। *

---

* এক্ষণে পাঠক! বিবেচনা করুন, ঘটনাটা কি? এই রমণী যে বিশুদ্ধ-চরিত্রা ও ধর্ম্মানুরাগিণী তাহাতে আর সংশয় নাই। ইনি, নির্জ্জনে যোগ সাধনোদ্দেশে এই নিভৃত স্থানে নিত্য আসিতেন, তাহা ত আপনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এই শুভ্রকান্তি দেবদূত কে? আর তাঁহার হস্তস্থিত পান-পাত্রই বা কি? জনৈক সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি বলেন, এই দেবদূত নামে বর্ণিত সাধু পুরুষ রমণীর দীক্ষাগুরু, তিনি অতি প্রাচীন ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, তদীয় শ্বেতশ্মশ্রু ও শ্বেত কেশরাশিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন সুধা-ধবলিত সৌন্দর্য্যে পর্য্যবেশিত হইয়াছে। আর সেই পাত্র? তাহা তাঁহার অমৃতায়মান তত্ত্বজ্ঞান-ভাণ্ডার ব্যতীত কিছুই নহে।

এক্ষণে একটী কথা—মহর্ষি মন্‌সুরের উন্মত্ততার পরিনাম-ফল পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষির ভগিনীর সহিত তাঁহার পরিণাম ঘটনার দুই একটী বিষয়ের সংশ্রব আছে। কিন্তু তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করার আবশ্যকতা বিবেচিত হয় নাই। ফলতঃ সেই ঘটনা যে তদীয় সহৃদয়া সহোদরার মাহাত্ম্যপ্রকাশক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তজ্জন্যই (অপ্রাসঙ্গিক হইলেও) এস্থলে সেই শেষের একটী ঘটনার কথা অগ্রে বলিতে বাধ্য হইলাম।

কথিত আছে, মহর্ষির দেহাবসানের অব্যবহিত পরে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার প্রশংসা-কীর্ত্তন করিয়া কহেন, "মন্‌সুর এমনি তেজস্বী সাধু পুরুষ ছিলেন যে, আপনি যাহা সত্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, তথাপি সহস্র পীড়নেও তাহা হইতে বিচ্যুত হইলেন না।" তাঁহার ভগিনী এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত সদুঃখে কহিয়াছিলেন, "তোমরা নিতান্ত ভ্রান্ত! আমার ভ্রাতা যদি পুরুষ হইত, যদি তাহার কিঞ্চিৎ পৌরুষ থাকিত, তাহা হইলে পাত্র লেহন করিয়া খাইয়া কি উন্মত্ত হইত? পুর্ণ পাত্র পানেও সে অবিচলিত—স্থির—ধীরভাবে থাকিত। আমি তাহাকে পুরুষ বলিয়া গণ্য করি না।" ইহাই বলিয়া অতঃপর উত্তেজনার বশে বলিয়া ফেলিলেন, "আজ বিংশতি

বর্ষ হইতে চলিল, আমি প্রত্যেক রজনীতে এই দৈব প্রেমামৃত পূর্ণ মাত্রার পান করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কৈ, কথন মুহূর্ত্তের জন্যও ত বিচলিত হই নাই !! আমার রসনা অবাধ্য হইয়া কথন ত অন্যায়াচরণ করে নাই !! বরং নিয়ত নম্রতার সহিত প্রার্থনা করিয়াছে, হে দয়াময় প্রভো ! এতদপেক্ষা অধিকতর উন্নতি-মার্গে আমাকে আকর্ষণ করুন।”

প্রিয় পাঠক ! দেখুন কি তেজস্বিতা। কি অপূর্ব্ব নারী-হৃদয়ের বল !! কি অলৌকিক সাধন-সহিষ্ণুতা !!! ইনি কি মানবী ? না দেবী ? কে না বলিবে ইনি মানবী-আকারে মর্ত্তধামে বরণীয়া দেবী ছিলেন !! ফলতঃ তত্ত্বদর্শী, পরিশুদ্ধ প্রেমোন্মত্ত মহর্ষি মনস্থুর অপেক্ষাও যে; এই তপস্তেজঃ-শালিনী অমরাঙ্গণার তপশ্চারণ উচ্চতর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মন্‌সুরের ইসলামধর্ম্মবিগর্হিত অন্যায় উক্তি, ধর্ম্মভীরু মুসলমান জনসাধারণের হৃদয়ে যেন সুতীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহারা সাতিশয় উত্ত্যক্ত ও মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। অনেকে তাঁহার প্রাণসংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই মুহূর্ত্তেই মন্‌সুরের মস্তক দেহ হইতে অসিপ্রহারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, ইহাই অনেক অসহিষ্ণু ব্যক্তির অভিপ্রায়। ধর্ম্ম-যাজকগণ মন্‌সুরের অবৈধ আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া বিষম বিরক্তিসহকারে বদনমণ্ডল বিকৃত পূর্ব্বক কর্ণে হস্তার্পণ করিলেন। কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতাশালী ধৈর্য্যশীল সিদ্ধপুরুষ মন্‌সুর তাহাতেও বিচলিত হইলেন না।

"হায় হায় মন্‌সুরের কি হইল, আহা, কেন তাঁর এ কুমতি ঘটিল" এবংবিধ বাক্যে অগণ্য লোক অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক দয়ার্দ্র ব্যক্তি সমবেত হইয়া মন্‌সুরকে সানুনয়ে কহিলেন, "আপনাকে আমাদের একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। আপনি "আনাল হক্"

শব্দের পরিবর্ত্তে "হু অল্ হক্" * বলিতে থাকুন। বোধ হয়, আমাদের এই অনুরোধের কারণ আর আপনাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আপনি স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞান-গরীয়ান্; অবশ্যই ইহার গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।" মহর্ষি এতদ্-শ্রবণে মৃদুগম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, সমুদয়ই বুঝিতে পারিয়াছি, আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু নহি; অনুপম দাতা ও দয়ালু আল্লার অসীম অনুগ্রহে বুঝিবার শক্তি আমার আছে। সত্য বটে, তিনিই ঈশ্বর—সমুদয়ই তিনি। তিনি সর্ব্বময়, তিনি বিশ্বব্যাপী, তিনি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বসময়েই বিদ্যমান ছিলেন,—আছেন ও থাকিবেন।—

নগর ভিতরে, বিজন কান্তারে,
জন-প্রাণী-হীন মরুভূ-মাঝারে,
উচ্চ-গিরি-শিরে, নীল সিন্ধু-নীরে,
সুখদ আলোকে, দুঃখদ তিমিরে,
নরের অগম্য পর্ব্বত-গুহায়,
বজ্রাগ্নি-জড়িত জলদ-মালায়,
আকাশে, পাতালে, অনিলে, অনলে,
সুদূর সুমেরু কুমেরু মণ্ডলে,

* "হু অল্ হক্" অর্থাৎ তিনিই ঈশ্বর।

গোলাপী-অধরা উষার ললাটে,
স্তিমিত-নয়ন প্রদোষের প্লাটে,
ফল, ফুল, তরু, লতায়, পাতায়,
ফুলের সৌরভে, ফল-স্বাদুতায়,
অমৃতে গরলে, জলের কল্লোলে,
পাবক-শিখায়, পবন-হিল্লোলে,
সমুজ্জ্বল ছবি রবির প্রভায়,
চাঁদের কিরণে, রম্য তারকায়,
সংহার-মূরতি সমর প্রাঙ্গনে,
কেলি-লীলা-ভূমি প্রমোদ-কাননে,
সূক্ষ্ম বালুকণে, মানবের মনে,
দীনের কুটীরে, রাজার ভবনে,
তোমাতে, আমাতে, ধনী, বিত্তহীনে,
পতঙ্গ, কীটাণু, পশু পক্ষী মীনে,
আরো আছে যত, নাম কব কত ?
সব তাতে তাঁর বিরাজ সতত ! !

আহা ! তিনি সকল স্থানেই সকল, সময়েই সমভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! আমি তোমাদের কথায় বুঝিতেছি, তিনি যেন কোন সুদূর অপরিজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। আমরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত ও

অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি; তবুও তাঁহার দর্শন মিলিতেছে না, সে হারান ধনের—সে অমূল্য রত্নের উদ্দেশ পাইতেছি না। এ কি অদ্ভুত কথা! কি অযৌক্তিক প্রলাপ বচন! কি ভয়ানক ভ্রান্তি!! চক্ষুষ্মান্ বিবেকী ব্যক্তি, কখন কি একথা বলিতে সাহস করে? ভ্রাতৃগণ! তিনি কি হারাইবার সামগ্রী? ঐ দেখ দেখ, যদি নয়ন থাকে, উন্মীলন করিয়া দেখ, অপরূপ বিরাটরূপে নয়ন-মন বিমোহিত করিয়া তিনি চতুর্দ্দিকেই বিরাজিত রহিয়াছেন। চন্দ্র, সূর্য্য ও অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রাদির আধার অনন্ত আকাশ কি ক্ষুদ্র নেত্রের অন্তরালে ঢাকা যাইতে পারে? বিস্তীর্ণ মহাবারিধির লয় নাই, তাহা চির-দিনই সমভাবে বর্ত্তমান। বরং আমি,—সামান্য জলবুদ্বুদমাত্র, তন্মধ্যে পড়িয়া কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছি। আমার চিহ্ন বা সত্ত্বার লেশমাত্র নাই। হায়, আমার আমিত্ব কোথায়?" ইহা বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। তখন অনু-রোধকারী ব্যক্তিগণের মনে আরও ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাঁহারা ইহার প্রতিকার-প্রত্যাশায় উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ইস্লামের প্রকাশ্য ক্রিয়াশীল সেই ব্যক্তিবৃন্দ, ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিতদিগের নিকটে যাইয়া এই ব্যাপার জ্ঞাপন করিলেন। ধর্ম্মানুরাগী পণ্ডিতমণ্ডলী তৎশ্রবণে

সাতিশয় চমকিত হইয়া নানাপ্রকার বাদানুবাদ ও অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা একত্রিত হইয়া ধর্ম্ম-প্রতিনিধি খলিফার সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া বিষণ্ণবদনে মনসুরের বৃত্তান্ত যথাযথ বিবৃত করিলেন। ইস্‌লাম-ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে ঈদৃশ ধর্ম্মদ্রোহীর শিরশ্ছেদন করাই উচিত, একথাও তাঁহারা সাগ্রহে প্রকাশ করিলেন। তৎকালে যিনি মহামান্য খলিফার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তিনি এক জন কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি। পবিত্র শরিয়ত * বহির্ভূত কোনও কার্য্য দেখিলে তিনি কাহাকেও মার্জ্জনা করিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধরিয়া দোষীর দণ্ডবিধান ও নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করিতেন। তিনি মনসুরের অধর্ম্মোক্তির বিষয় অবগত হইয়া, প্রথমতঃ "পাপ পাপ" বলিয়া ম্লানমুখে কর্ণকুহরে হস্তার্পণ করিলেন। পরে অধোবদনে নীরব হইয়া কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; কাহাকেও কিছু কহিলেন না। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইল দেখিয়া আগন্তুকগণ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "ইস্‌লাম-সমাজপতে! আপনাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া

* শরিয়ত বা শরা—মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ কোরাণ শরিফ, হাদিস্ শরিফ এজ্‌মা এবং কেয়াস।

আমরা ভীত ও বিচলিত হইয়াছি। শাস্ত্রানুমোদিত শুভ কার্য্য পরিপালনার্থ পাপ-প্রতিকারে নিশ্চেষ্ট থাকার কারণ ত কিছুই বুঝিতে পারি না? যদি পবিত্র "শরিয়ত" অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, যদি ধর্ম্মাবমাননার প্রতিবিধান করিতে চান, দুষ্টের দমন যদি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন, তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন। আপনি ধর্ম্মের রক্ষক এবং আমাদের প্রতিপালক, আপনি বৈধ ব্যাপারে শৈথিল্য বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে নির্ম্মল ইস্‌লাম-ধর্ম্মে কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষিপ্ত হইবে, একেশ্বরবাদের গৌরবোন্নত মস্তক, এবং আমাদের উজ্জ্বল মুখ এই নিদারুণ ধর্ম্মাবমাননায় নিষ্প্রভ হইবে। ক্ষুদ্র আমরা, ইহা ব্যতীত আপনাকে আমাদের আর কি অধিক বলিবার ক্ষমতা আছে, প্রভো?" প্রজারঞ্জক খলিফা নীরবে সমস্তই শুনিলেন। বুঝিলেন তাঁহাদের মর্ম্মে কি অসহনীয় ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে। পরন্তু সাধারণের অভিপ্রায় এবং মন্সুরের পরিণাম, এই উভয় দিক্ ভাবিয়া সেই আঘাতের প্রতিঘাত তিনি আপনিও অনুভব করিলেন। তাই তিনি স্থির ধীর নীরব গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কি করিবেন, অবশেষে অনেক চিন্তার পর, এই প্রকাশ্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, ক্ষুব্ধ-

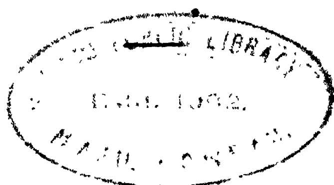
চিত্তে মন্‌সুরকে কারাগারে বন্দী করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। অহো কি আক্ষেপ! কি ঘোর যাতনা! খলিফার অনুজ্ঞামাত্র ধর্ম্মপ্রাণ মন্‌সুর রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কষ্টময় কারাগৃহে বন্দী হইলেন। অমনি দরবারে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল; বোগ্‌দাদের ঘরে ঘরে আন্দোলন-স্রোত চলিল; মন্‌সুরের দুঃখে কেহ হৃষ্ট, কেহ রুষ্ট; কেহ বা নীরবে অশ্রুমোচনে নিরত হইল।

জনৈক গ্রন্থকার আপন গ্রন্থমধ্যে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, যখন রাজপুরুষগণ মহর্ষিকে ধৃত করিয়া কারাগারাভিমুখে লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে এক অজ্ঞ ব্যক্তি অবজ্ঞার সহিত উপহাস করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মন্‌সুরকে কহে "ওহে সাধু! তুমি যদি সাধনার বলে প্রকৃত সিদ্ধ-পুরুষ হইয়া থাক, তবে আজ তোমার এ ভয়ানক দুর্গতি দেখিতেছি কেন? তোমার সেই তপোবল কি এই সামান্য সৈন্যবলের নিকট পরাভূত হইল? দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল-সংগ্রামে ভীরুপ্রকৃতি অজের জয়! এ অতি আশ্চর্য্য ও বিড়ম্বনা দেখিতেছি। হায় ভণ্ড যোগি! যদি তুমি বাস্তবিকই সাধক হইতে, যদি তোমার অণুমাত্রও সাধনার বল থাকিত, তাহা হইলে শতসহস্র বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়াও আজ এই কষ্টকর বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে অবলীলাক্রমে আত্মরক্ষণে সমর্থ

হইতে। অহো! যে অদূরদর্শী ব্যক্তি ছলনার ছদ্মবেশে দেহাবৃত করিয়া ও "ধর্ম্মের ভাণ করিয়া অধর্ম্মের সঞ্চয় করে এবং তদ্ধেতু পরিশেষে আপনি ঘোর বিপদে পতিত হয়, এ জগতে তাহার অপেক্ষা অধিক অর্ব্বাচীন ব্যক্তি আর কে আছে?"

মহর্ষির কর্ণকুহরে এই বিদ্রূপসূচক কটূক্তি সুতীক্ষ্ণ শেলের ন্যায় প্রবেশ করিল। মূর্খের কর্কশ বাক্যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করা অনুচিত জানিলেও, তিনি কেবল তাহাকে অপ্রতিভ করণার্থ শ্রবণমাত্র তন্মুহূর্ত্তে সেই সশস্ত্র রাজ-প্রহরী-বেষ্টিত ও নাগরিকগণের জনতার মধ্যস্থলে থাকিয়া শত-সহস্র সতর্ক নেত্রে ধাঁধা লাগাইয়া, সহসা যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, তাহা কেহ অনুভব করিতেও পারিল না। তখন রাজকিঙ্করগণ ও জনসাধারণ সকলেই বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত, বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মুখে শব্দ নাই, নয়নে পলক নাই, হৃদয়ে শোণিত অচল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পন্দন-রহিত, শক্তি-শূন্য—স্থির! নাট্যশালায় পট-পরিবর্ত্তনের ন্যায় কি যেন এক ঐন্দ্রজালিক অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল। ভাবিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কূটবুদ্ধি প্রহরিগণও এ ব্যাপারে ম্রিয়মাণ,—সংজ্ঞাহারা। পরে তাহাদের কথঞ্চিৎ চৈতন্যোদয়

হইলে, "হায় কি হইল, কোথায় গেল, কোথায় গেলে তাহাকে পাইব, খলিফা শুনিলে কি বলিবেন, তাঁহার সম্মুখে কি উত্তর করিব ; হায় না জানি কি কঠোর শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে, এত লোকের হস্ত হইতে পলায়ন! ছি ছি কি লজ্জার কথা, কি অপমানের বিষয়, কি করিয়া রাজদরবারে এ পোড়া মুখ দেখাইব ? দেশদেশান্তরের লোক এ কথা শুনিলেই বা কি বলিবে! হায় হায় এমন বিপদে কখন ত কেহ পড়ে নাই! ইত্যাকার অনুতাপ-বাক্যে মহা হুলস্থুল বাধাইয়া দিল। কেহ কিঞ্চিৎ মৌখিক সাহস করিয়া কহিল, "ওরে ভাই! ভাবিয়া কি হইবে ; ভয়ই বা কি কিসের ? আমরা ত আর সাধ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিই নাই! সে যে একটা ভয়ানক মায়াবী, তাহা সকলেই জানিয়াছে! মায়াবিদ্যা প্রভাবে যাহার অদৃশ্য হইবার শক্তি আছে, তাহাকে আমরা কেন ? জগতের যাবতীয় রাজশক্তি একত্রিত হইলেও শাসনে রাখিতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব সকলে চল, খলিফার হুজুরে একথা জানাইগে। আর তিনিই কি ইহা অবগত নহেন ?" অনেকের কিন্তু এই সাহসের উক্তিতে মন আকৃষ্ট হইল না ; তাহারা হতাশ মলিন-মুখে মস্তকে হাত দিয়া অবশাঙ্গে বসিয়া পড়িল।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বন্দী পলায়ন করিয়াছে। প্রহরিগণ ব্যস্ততার সহিত দিগে দিগে অনুসন্ধানে ফিরিতেছে, নগরময় মহা-আন্দোলন-কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু কিরূপে কোন্ দিকে পলায়ন করিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। যাহাদের তত্ত্বাবধানে তিনি যাইতেছিলেন, তাহারাও এই ছিল, এই নাই ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারে না। আপন আপন বুদ্ধির প্রাখর্য্যানুসারে কত জন কত কথার অবতারণা করিতেছে, কত কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে। এদিকে সাধক-শ্রেষ্ঠ মন্‌সুর দৈব-শক্তিপ্রভাবে অদৃশ্য হইয়া স্ব-ভবনে আসিয়া উপস্থিত। তিনি পূর্ব্বনিয়মানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া নিরাপদে নিরুদ্বেগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধিৎসু জনগণ কেহই তাঁহার দর্শন পাইত না। কিন্তু তিনি কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির প্রতি সদয় হইয়া সাক্ষাৎ করিতেন ও প্রীতিসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেন। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সময়ে দর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি যে বস্তু তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেন, তিনি তাহাই পাইতেন। সে

বস্তু দুষ্প্রাপ্যই হউক, আর সুলভ লভ্যই হউক, তপোধন তদ্দণ্ডে হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক এই ধর' বলিয়া তপোবলে সেই সেই দ্রব্য প্রদানে যাচকের সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন, তাহাতে অণুমাত্র বিলম্ব বা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতেন না। আবার কখন তিনি লোক-লোচনের গোচরে আসিয়া স্ব-ইচ্ছায় ধৃত হইয়া কারাগৃহে নীত হইতেন; কিন্তু আবার পরক্ষণেই যোগবলে তথা হইতে অদৃশ্য হইয়া নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিতেন। এইরূপে তিনি ঐন্দ্রজালিকের মায়াবিস্তার ন্যায় বিবিধ প্রকার অত্যদ্ভুত কার্য্য দ্বারা সকলকে বিস্ময়াভিভূত করিতে লাগিলেন। সাধারণে তাঁহার এবংবিধ অলৌকিক কার্য্য-ক্ষমতা দেখিয়াও ঈর্ষাবশতঃ অপযশঃ ব্যতীত কেহই তাঁহার প্রশংসা করিত না। এই অবস্থায় অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। মনসুরের সম্বন্ধে আপামর সাধারণের মধ্যে নিত্য নূতন নূতন বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খেরা মনসুর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে আছেন, ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস করিল। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহাতে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন।

একদা মহর্ষি বন্দী অবস্থায় কারাবাসে উপনীত হইয়া দেখেন, অসংখ্য বন্দী সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহার কোমল

অন্তরে আঘাত লাগিল। তিনি দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদের সেই ভীষণ কষ্টের উপশম করণার্থ চিন্তান্বিত হইলেন। অবশেষে দিবা গতে রাত্রি উপস্থিত হইলে, তিনি প্রত্যেকের কারাবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্দীবৃন্দ আপন আপন দুর্দ্দশার পূর্ব্বঘটনার বর্ণনা করিলে পর, তপস্বীপ্রবর কহিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আমি তোমাদিগকে এই মুহূর্ত্তেই এই অসহ্য কারা-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিপ্রদান করিতেছি। তোমরা আমার কথা শুন, এই নরকতুল্য অগম্য স্থান হইতে আপন আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান কর, ইহাতে আর কালবিলম্ব করিও না।" তখন বন্দীগণ কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরস্বরে কহিল, "মহাত্মন্! আমাদের এমন সৌভাগ্য কি হইবে? আমরা কি স্ত্রী-পুত্র কন্যার মুখ দেখিয়া ইহ-জীবনে আবার কি আনন্দলাভ করিতে পারিব? আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি যে নিশার স্বপ্নবৎ অলীক। এই দেখুন, আমাদের হস্ত-পদ লৌহ-শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, পার্শ্বপরিবর্ত্তন করি বা এক পদ অগ্রসর হই, আমাদের এরূপ সামর্থ্য নাই। সুতরাং ইহ-জীবনে আমাদের আর পরিত্রাণের আশা কোথায় আছে, বলুন দেখি? অহো! সে আশা সুদূরপরাহত। তবে যদি আপনার আশীর্ব্বাদে এই মন্দভাগ্যদের প্রতি দৈব কখন অনুকূল হন, তাহা হইলে একথা এক দিন সম্ভব

হইলেও হইতে পারে। নতুবা আকাশের চন্দ্র-ধারণের ন্যায়, পঙ্গুর পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনের ন্যায় নিষ্ফল কল্পনা করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে আরও যন্ত্রণাদায়ক ও বিপজ্জনক বলিয়া জানিবেন।” বন্দীদিগের এবংবিধ কাতরোক্তি শুনিয়া দয়া-প্রবণ-হৃদয় মন্‌সুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাহা-দের উদ্দেশে ঊর্দ্ধমুখে হস্তোত্তোলন করতঃ সজোরে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। কি আশ্চর্য্য তপোবল! কি অপার্থিব ঈশ্বরানুরক্তি!! মহর্ষির পূত হস্ত নিম্নমুখে যেই আকৃষ্ট হইল, অমনি কয়েদীদিগের হস্তপদ-নিবদ্ধ শৃঙ্খলনিচয় খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ঝন্‌ঝনায়মান শব্দ করত ভূতলে নিপতিত হইল। বন্দীগণ, হস্ত পদের বন্ধন বিমুক্ত ও নরকযন্ত্রণার অবসান হইল দেখিয়া, সোৎসাহে উঠিয়া মহর্ষির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং সহর্ষে যুক্তকরে কহিল, “মহাভাগ! করুণাময় জগৎপাতার ইচ্ছায় ও আপনার ঐকান্তিক যত্নে এবং আশীর্ব্বাদে সংপ্রতি আমরা বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি-লাভ করিলাম বটে, কিন্তু বলুন, কি উপায়ে এই ঘোর বিপদ-সঙ্কুল অন্ধতমসাচ্ছন্ন পুরী হইতে প্রস্থান করি? অত্যুচ্চ নগরাজ সদৃশ দুর্ভেদ্য উন্নত প্রাচীরে কারাগার পরিবেষ্টিত, যমদূতাকৃতি অসংখ্য ভীষণদর্শন সশস্ত্র প্রহরী দিবারজনী চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, লৌহ-বিনির্ম্মিত অতি দৃঢ়

কবাট কঠিন কুলিশোপম তালা সমূহে আবদ্ধ। এতদ্ব্যতীত আরও বহুবিধ অন্তরায় রহিয়াছে। পিপীলিকা প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ পথও এখানে নাই, তবে বলুন ত, আপনার এ মন্দভাগ্য ভৃত্যগণের কি এমন দৈব-শক্তি আছে, যৎপ্রভাবে তাহারা নিরাপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঈপ্সিত স্থানে প্রস্থান করিতে পারে?" এই খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া তাপসপ্রবর স্বকীয় গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চতুঃপার্শ্বে নেত্রপাত করিলেন। তাহাতে মহর্ষির দৈবশক্তি-বলে কারাবাসের চতুর্দ্দিকস্থ বিশাল ভিত্তিতে মানব-দেহ-প্রবেশোপযোগী সংখ্যাতীত গবাক্ষের সৃষ্টি হইল।* তদ্দর্শনে বন্দীগণের হৃদয় বিস্ময়-রসে আপ্লুত, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও স্বেদার্দ্র হইল—ভাবিয়া আকাশ পাতাল কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অতঃপর তাহারা তপস্বীর

* বর্ত্তমানের সভ্য সমাজ ঈদৃশী ঘটনা বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিতে পারেন বটে, কিন্তু অবিশ্বাস করিবারও কোন কারণ নাই। মনুষ্য যোগবলে—সাধন-শক্তিতে অলৌকিক-ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কি না করিতে পারেন? অমুক সাধু দীর্ঘকাল মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত ছিলেন, শূন্যপথে প্রয়াণ, নদীর উপর দিয়া গমন করিয়াছিলেন, এ সকল একেবারে ভিত্তিশূন্য কথা নহে। পৃথিবীর সর্ব্ব জাতীয়ের সাহিত্য-ইতিহাসে এবংবিধ বহু ঘটনার উল্লেখ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

ইঙ্গিতক্রমে সেই সদ্যসৃষ্ট গবাক্ষদ্বার দিয়া অলক্ষ্যে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল,- প্রহরীগণ তাহার অণুমাত্রও অনুভব করিতে সমর্থ হইল না।

পর দিবস নিশাবসানে কারারক্ষকগণ বন্দীদিগের তত্ত্ব লইতে গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না ; তখন সকলেই চমকিত, চিন্তিত ও ভয়াকুল হইল। ক্রমে এই বিস্ময়জনক ঘটনা রাজপুরুষগণের কর্ণে উঠিল। কারাধ্যক্ষ, কারাগার পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখেন, কারাগৃহ নিস্তব্ধ ও নির্জ্জন, কারাবাসীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল দেখিতে পাইলেন, মহাযোগী হোসেন মনসুর ধ্যানস্তিমিত-নেত্রে গম্ভীর-ভাবে এক প্রান্তে একাকী উপবিষ্ট আছেন। এতদ্ব্যতীত কারা-প্রাচীরে অসংখ্য গবাক্ষ-দ্বার দৃষ্ট করিলেন। এই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শনে কারাধ্যক্ষ নিরতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। যুগপৎ হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময় ও ভয় তাঁহার অন্তরাত্মাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল,—সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। ক্ষণেক স্থিরদৃষ্টে এক দিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিলেন। আহা কি অলৌকিক ক্ষমতা! কি অমানুষিক চমৎকারজনক কার্য্য! এই অশ্রুত ও অভূতপূর্ব্ব অপার্থিব ব্যাপার তপস্বীকুল-শিরোভূষণ মহাত্মা মনসুর কর্ত্তৃক সমাহিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তাঁহার হৃদয়ে বিস্ময়-

সহ ভক্তির উদ্রেক হইল। আবার এক জন মহামনা পবিত্র পুরুষকে পাপপঙ্কিল নিকৃষ্টচরিত্র দুর্জ্জনদিগের সহিত একত্রে কারাবদ্ধ করা হইয়াছে, সুতরাং তন্নিমিত্ত পরিণামে পরমকারুণিক বিশ্বপাতার সমীপে না জানি কত অপরাধী ও দণ্ডার্হ হইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া নিমেষ মধ্যে গাঢ় কৃষ্ণ বিষাদ-বারিদের সঞ্চারে তদীয় নির্ম্মল চিত্তাকাশ মলিনমূর্ত্তি ধারণ করিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ অপলকনেত্রে ললাটভাগ কুঞ্চিত করিয়া বিরসবদনে নীরব রহিলেন। অতঃপর নিরীহ কারাধ্যক্ষ মৃদুপদে মহর্ষির নিকটবর্ত্তী হইয়া অবনতমস্তকে অভিবাদন পূর্ব্বক হস্তপদে চুম্বন প্রদান ও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বিনয়নম্রবচনে শত শত সাধুবাদ প্রদানানন্তর গদগদকণ্ঠে কহিলেন, "মহাভাগ! আমরা রাজাজ্ঞানুসারে আপনার প্রতি যাদৃশ উৎপীড়ন করিয়াছি, তাহাতে আপনার সমক্ষে পুনর্ব্বার বাক্যস্ফুরণ করিতে সাহস হয় না। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে নির্লজ্জ হইয়া একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে অগ্রসর হইতেছি। আমি রাজ-কিঙ্কর, এই বন্দীশালার তত্ত্বাবধানকার্য্য আমার উপর ন্যস্ত আছে। বন্দী-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্রও গোলযোগ বা বিশৃঙ্খল ঘটিলে আমাকে বিপন্ন হইতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে যেরূপ সঙ্কট উপস্থিত, তাহাতে আমার জীবন-সংশয় নিশ্চয়,

ভাবিয়া আকুল হইয়াছি। সাধু-প্রবর! কেবল আপনার এই দীন দাসের জীবন গেলে দুঃখ ছিল না। বরং তাহাতে পাপী তাপী আমি আপনাকে সুখী ও কৃতার্থ বোধ করিতাম। কেননা এক জন ঈশ্বরপরায়ণ পবিত্র পুরুষের কৃতকার্য্য, যদি অপরের জীবন নাশের কারণ হয়, তবে তাহা কম সৌভাগ্য ও পুণ্যের কথা নহে। কিন্তু যেরূপ সর্ব্বনাশকর মহান্ অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে আমি বুঝিতেছি, আমার, আমার অধীন কর্ম্মচারীগণের এবং আমার পুত্রকলত্রাদির পর্য্যন্ত প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা। তাই আমি ভীতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "এই যে শমনপুরী সন্নিভ প্রহরী-বেষ্টিত ভীষণ কারা-ভবন, যাহার নাম শ্রবণে জগৎ আতঙ্কিত হইয়া থাকে, যাহাতে ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকারও নিষ্ক্রমণের পথ নাই, বিশ্বব্যাপী সমীরণ ও রবি-রশ্মিও যেখানে সঞ্চরণ করিতে কুণ্ঠিত হয়, সেহেন কঠিন স্থান হইতে অপরাধীবৃন্দ কিরূপে কখন্ কোথায় পলায়ন করিল, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা বলিয়া এ দীনের উদ্বিগ্ন চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করুন। তেজস্বী তাপস কহিলেন, "ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইলে পার্থিব নিগ্রহের অবসান হইয়া থাকে। বন্দীরা আজ ঈশ্বরানুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়াছে।" তখন কারাধ্যক্ষ কহিলেন, "তবে আপনি আর এস্থলে বসিয়া নিরর্থক কষ্টভোগ করিতেছেন কেন? আপনি ত সর্ব্বাগ্রে প্রস্থান করিতে পারিতেন?"

আমি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আপনিও স্ব ভবনে প্রত্যাগমন করুন। নিয়তিলিপি খণ্ডনীয় নহে; আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। রাজপুরুষগণ এই অত্যদ্ভুত ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, আমার উপর উৎপীড়ন হইলে, আমি যদৃচ্ছা উত্তর প্রদান করিব।” মনসুর কহিলেন, “কোথায় যাইব? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, ইহ-জগতে তাহার পলাইবার স্থান বা উপায় কোথায় আছে? অথবা পলাইলেও কি তাহার রক্ষা হইতে পারে? আমি বিস্তীর্ণ অম্বুনিধিবক্ষ-ভাসমান অসহায় তৃণখণ্ডের ন্যায় অনন্ত পাথারে দেহ-তরী ভাসাইয়া দিয়াছি। অনন্ত—অপার—অসীম বারিরাশি চতুর্দ্দিকে মরুস্থলের ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে, তরঙ্গাভিঘাতে নিমেষে শতবার নিমজ্জিত ও শতবার উত্থিত হইতেছি; সৈকতভূমি-সংলগ্ন হইবার আশা সুদূরপরাহত। দিশাহারা হইয়া কূল খুঁজিয়া পাইতেছি না। সুতরাং এখান হইতে চলিয়া যাইতে আমার প্রবৃত্তি নাই। রাজদণ্ডে আর ভয় করিয়া কি করিব? প্রাণ যাউক, দৈহিক পরমাণু পরমাণ্বন্তরে যাইয়া বিলয়প্রাপ্ত হউক, “মনসুর” এ হেয় নাম পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। মৃত্যুকে ত আমি কুশলকামী পরমবন্ধু বিবেচনা করি, তীক্ষাগ্র শূলাস্ত্র ত আমার সুখ-স্থান প্রবেশের সুখময় প্রশস্ত সোপান।

আহা, কবে সে সুখ-সোপানে আরোহণ করিব? কবে সে দিন আসিবে? কিন্তু সুখের দিন সহজে আসিতে চায় না, ইহা এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি। কারাপতে! এক্ষণে তুমি যাও, আমার প্রিয় কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইও না, এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আমি এখানে থাকিতে অসন্তুষ্ট নহি।”

বুদ্ধিমান্ জেলপরিরক্ষক মনসুরের সারগর্ভ বাক্যের গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন মহর্ষি নির্জ্জনে উপযুক্ত সময় পাইয়া একাগ্রচিত্তে যথারীতি অজু অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি-সঙ্গত হস্ত-পদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক অঙ্গ-শুদ্ধি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পরে কায়মনোবাক্যে পরম করুণাময় নিখিলকর্ত্তার উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া নামাজে নিরত হইলেন। তদীয় ভক্তির উৎস উচ্ছ্বাসিত হইল। তিনি পবিত্র ঐশিক প্রেমে বিভোর হইয়া একেবারে স্পন্দনশক্তি-রহিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, উপাসনা সাঙ্গ হইলে তন্ময়চিত্তে হস্তদ্বয় উত্তোলন করত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—“জগৎপতে! হে ভূত-ভাবন ভুবনপালক! হে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বান্তর্য্যামী অনাদি পুরুষ! তোমার অপার কৃপাপারাবারের বিন্দু-বারি বিতরণে আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর। তুমিই একমাত্র দয়াময় দাতা; তুমিই এই অখিল সংসারে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে দয়ার্দ্র প্রেমময়, তুমিই বিশ্বরাজ্যের

একমাত্র রাজরাজেশ্বর মহারাজ-চক্রবর্ত্তী; তোমার রাজ্যে—তোমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে, এমন কেহই বিদ্যমান নাই। তুমি সর্ব্বান্তর্যামী, ক্ষুদ্রবৃহৎ, উচ্চনীচ, দরিদ্র-ধনবান, পণ্ডিতমূর্খ সকলেরই অন্তরের ভাব তুমি অবগত আছ; তোমার সকাশে সকলই ব্যক্ত,—কিছুই লুক্কায়িত নাই। জগৎ; জগতীস্থ স্থাবরজঙ্গম পদার্থনিচয়, স্বর্গনরক তোমারই সৃষ্ট। তুমিই নিঃসন্দেহ সর্ব্বনিয়ন্তা, স্রষ্টা ও পাতা। তোমার চিরস্থায়ী সুন্দর নিয়মে, তোমার অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি-পরিবেষ্টিত এই ভূমণ্ডলের যাবতীয় কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য প্রভু-শক্তি! কি সুদৃঢ় শাসন-বন্ধন!! তোমার আজ্ঞা ব্যতীত ক্ষুদ্র এক তৃণ খণ্ডেরও হেলিবার সাধ্য নাই। প্রেমময়! তোমার পবিত্র প্রেমে তুমিই আমাকে উন্মত্ত করিয়াছ। তুমি প্রেমিকের প্রাণের প্রফুল্লতা দিতে সমর্থ। তুমি দয়াময়—স্নেহ-প্রবণ-হৃদয়। ব্যথিতের যন্ত্রণা বুঝিতে, পীড়িতের রোগ-প্রতিকার করিতে, তুমি বিনা আমার আর কে আছে? আমি পীড়িত, তোমার সম্মিলনরূপ অমোঘ ঔষধ প্রদানে আমার চিরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ কর! তোমার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ আছি—হৃদয় জর্জ্জরিত, প্রাণ অবসন্ন, আর বিলম্ব সহ্য হয় না; আশা পূর্ণ কর। অহো! চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছি;

মনোপ্রাণ দুর্ব্বিষহ যাতনায় হু হু করিয়া জ্বলিতেছে, হৃদয়ে কে যেন ঘোর বিষবাণ বিদ্ধ করিতেছে। প্রভো! আমার কিরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে, তোমার ত তাহা অবিদিত নাই। দেখ, আজ কিনা আমি উন্মত্ত—পাগল; মন্‌সুর পাগল, তাই কারাগৃহে বন্দীভাবে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু সখে! পরম-সুখে আছি। সুগন্ধামোদিত কুসুমোদ্যান অথবা বিবিধ চিত্ত-চমৎকারী বিলাস-সাধন-সজ্জায় সজ্জিত তুষার-ধবলিত প্রাসাদ, ইহার তুলনায় অতি হেয়—অতি তুচ্ছ। কেননা তোমার জন্যই ত আমার ঈদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে। আমি তোমারই প্রেমাকাঙ্ক্ষী, তোমারই সম্মিলনপ্রার্থী, তোমারই বিচ্ছেদানল দিবানিশি আমার অন্তরে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; মিলনের সুশীতল বারিপ্রপাতে শীঘ্র সেই তীব্র অগ্নি নির্ব্বাণ কর। হে প্রাণারাম! আর যে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারি না; দর্শনোন্মত্তের প্রতি সদয় হও, ক্ষুধার্ত্ত পতঙ্গের মিলন-দীপ্তিতে তৃপ্তি সাধন কর। অধমকে তোমার প্রেমিক বলিয়া গ্রহণ কর! হো হো হো! এ আবার কি? এ আবার কি খেলা!! মিলন হইতে হইতে আবার নিরস্ত!! কৌশলি! এ আবার তোমার কি কৌশল? আর না,—তোমার আমার মধ্য হইতে পার্থক্যের পর্দ্দা ত্বরায় উঠাইয়া লও, আকাশ-পাতাল একাকার হউক! আমি তোমারই; তোমার

সঙ্গ লাভে তোমার পথে থাকিয়া, তোমার প্রেমে মজিয়া,—জগৎ বিরুদ্ধ হয়, হউক, তোমার দত্ত এ প্রাণ তোমার নামে উৎসর্গ করিতে—ধূলিময় এ সামান্য দেহকে শূলাগ্রে সমর্পণ করিতে আমি কুণ্ঠিত নহি, বরং সে কার্য্য সমধিক গৌরবের বলিয়া বিবেচনা করি। অতএব হে প্রিয় বন্ধো! হে সন্তাপিতের শান্তিদাতা! আমার মনের বাসনা সফল কর।"

তপোধন এবংপ্রকারে উপাসনা সম্পন্ন করিলেন। কথিত আছে, এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রার্থনাকালে করুণকাতরে অনুশোচনা করিতে দেখিয়া ঈষৎ কোপ এবং অবজ্ঞামিশ্রিত বিকৃত স্বরে কহে, "মহাত্মন্! আজ আপনাকে রক্তমাংসময় নর-জনোচিত কার্য্য করিতে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইয়াছি। বিধাতার অখণ্ডনীয় লিপি-নিয়মাধীন মন্দমতি মানব আমরা জগৎস্রষ্টার আরাধনা করিতে অবশ্যই বাধ্য। কিন্তু আপনি যখন স্বয়ং "আনাল হক্" বলিয়া ঈশ্বরত্বের দাবি করিতেছেন, তখন বলুন ত, আপনি আবার কোন্ ঈশ্বরের উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন? যে ব্যক্তি স্বয়ং অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বশক্তিধর অনাদি পুরুষ, তাহার কি কখন পুরুষান্তরের স্তবস্তুতির আবশ্যক করে? না তাঁহার কেহ উপাস্য থাকিতে পারে?" উন্মত্ত মনসুর এতদ্শ্রবণে গম্ভীর স্বরে কহিলেন,

ভদ্র! "তোমার এ প্রশ্ন বিবেচনামূলক বটে। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া অসূয়া-পরিশূন্য-হৃদয়ে কহিলে এ প্রশ্ন সমধিক আনন্দবিবর্দ্ধক ও প্রীতিকর হইত। কিন্তু সে অপরাধ তোমার নহে। মরণ-ধর্ম্মশীল অচিরদেহী অহঙ্কৃত মানবমাত্রই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া মোহবশে মূলমন্ত্র বিস্মৃত হইয়া অঙ্গীকৃত সুব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া ফেলে এবং অশুভপ্রদ অপকর্ম্মকে কল্যাণকর কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। এক্ষণে হৃদয়কে সরল পথে চালাও, আমার বাক্য প্রণিধান কর,—আমি নিজেরই উপাসনা,—নিজেরই স্তবস্তুতি নিজে করিয়া থাকি। আমার "নামাজে" আমারই প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। আমি নিজেই উপাস্য, নিজেই উপাসক, নিজে শিষ্য, নিজে গুরু, নিজে অনুসন্ধানকারী, নিজেই অনুসন্ধেয় বস্তু; নিজে প্রেমিক, নিজেই প্রেমাস্পদ, নিজে চাকচিক্যশালী সূক্ষ্ম বালু-কণা, নিজেই অনমুমেয় প্রকাণ্ড জ্যোতিঃ পদার্থ, নিজে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম। আমি স্বয়ং অপার অনন্ত মহাসমুদ্র, আবার স্বয়ং তন্মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র এক জলবিম্ব। অক্ষয় অবিনশ্বর সমুদ্র-বারি হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি এবং তাহাতেই তাহার স্থিতি। সুতরাং সমুদ্র ও জলবিম্বে কখন কি পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে? কখনই নহে। এতদুভয় কেহ কাহারও সঙ্গ

পরিত্যাগ করে না। একের বিয়োগে, একের অভাবে দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু অম্বুবিম্ব ক্ষণভঙ্গুর—অনিত্য, চিরস্থায়ী নহে; উহা পরিণামে প্রেমভরে ভগ্ন হইয়া সেই মহাসাগরেই বিলীন হইয়া থাকে। যখন সে আপনার অস্তিত্ব লোপ করিয়া শেষে সাগরেই মিলিত হইয়া যায়, তখন আর এটী জলধি এবং ইহা তজ্জাত বিম্ব, এরূপ পার্থক্য প্রদর্শন করিবার কারণ কি আছে? মুগ্ধ! চক্ষুর সদ্ব্যবহার কর, একবার তাহা উন্মীলন করিয়া দেখ,—এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় স্থানে, যাবতীয় পদার্থে সেই অচিন্ত্য-শক্তি বিশ্বপ্রকাশক সর্ব্বগুণৈক-নিলয় পরমপুরুষ মহিমা-গৌরবে সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। প্রত্যেক বস্তুতে তাঁহার সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নিহিত থাকিয়া জগতের আনন্দ-বিধান করিতেছে। যাহার অন্তর হইতে অন্ধকারাবরণ অন্তরিত হইয়াছে,—ব্যবধান তিরোহিত হইয়াছে, জ্ঞানাঞ্জন সহযোগে যাহার নয়ন-পঙ্কজ বিশদভাবে বিকশিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি সুস্পষ্টরূপে তদীয় বিশ্ব বসুধা-ব্যাপ্ত বিরাট একত্ব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাকে কোন্ মুখে দ্বিতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে,—কি প্রকারে তুমি আমি বলিয়া ভিন্ন ভাবিতে পারে? ইহাই বলিয়া ধর্ম্মোন্মত্ত মনসুর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার "আনাল হক্" "আনাল হক্" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এইরূপ বর্ণিত আছে যে, একদা নিশীথ কালে মহামনস্বী হোসেন মনসুর গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শয়ান ছিলেন এবং তদবস্থায় স্বপ্নযোগে এক কল্পনাতীত অপূর্ব্ব ঘটনা নয়নগোচর করেন। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, যেন এক বিস্তীর্ণ শুভ্র ভূমিখণ্ডের উপর একটী প্রকাণ্ড বস্ত্রাবাস স্থাপিত রহিয়াছে। বস্ত্রাবাসটীর শোভাসৌন্দর্য্য অতি মনোরম—বর্ণনাতীত। আহা শিল্পিপ্রবর তদীয় অত্যাশ্চর্য্য অকৃত্রিম শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় প্রদানার্থ যেন উহা অপরূপ বিশ্বোজ্জ্বলকারী সুস্নিগ্ধ জ্যোতিরাশি দ্বারা পরম যত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার চতুর্দ্দিক হইতে বিজলীপ্রভাগঞ্জন ঔজ্জ্বল্যলহরী বিনির্গত হইয়া দিগ্‌দিগন্তর আমোদিত ও আলোকিত করিতেছে। বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তরস্থ সাজসজ্জাসমূহের সৌন্দর্য্যই বা বর্ণনা করিয়া উঠে কাহার সাধ্য! তৎসমুদয় অলৌকিক ও অপার্থিব। রসনা তাহার বর্ণনা করিতে অক্ষম। ভাষা সেরূপ ভাবপ্রকাশক শব্দসমষ্টির কাঙ্গাল। নর-চক্ষু তাহা অনুভব করিবার অণুমাত্রও শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ফলতঃ সেই সমুদয় বিষয় মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক ও অতুলনীয় বটে, কিন্তু সর্ব্বোপরি সেই বস্ত্রাবাসাভ্যন্তরীণ মৃদু-মন্দ-মলয়-

মারুত-শীতলীকৃত ছায়ার গুরুত্ব, গরিমা ও মর্য্যাদা অধিক। কেননা নিদারুণ নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-উত্তাপে প্রতপ্ত ও ক্লিষ্ট জনগণ, সেই সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, শরীরের তাপ ও হৃদয়স্থিত কলুষরাশি বিদূরিত হইয়া সুবিমল সত্বগুণের সঞ্চরণে নিঃসন্দেহে ইহ-পারলৌকিক সুখ-শান্তি ও সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে।

বস্ত্রাবাসের মধ্যস্থলে মরকত-মণি বিখচিত কমনীয় কনকাসনোপরি জগজ্জন-হিতৈষী, জীবের একমাত্র পরিত্রাণপথ-প্রদর্শনকারী মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ মস্তফা প্রসন্নবদনে পবিত্রভাবে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার অলোকসামান্য সৌম্য-মূর্ত্তির জ্যোতিতে সর্ব্ব স্থান উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে এবং সেই সুকুমার স্বর্গীয় শরীরের সৌগন্ধে দশদিক প্রমোদিত করিয়াছে। হজরতের চতুষ্পার্শ্বে ইস্লামের গৌরব-মুকুট স্বরূপ ধর্ম্মপরায়ণ সাধুবৃন্দ ও ধর্ম্মযুদ্ধে নিধন-প্রাপ্ত বীর পুরুষগণ যথাযোগ্য আসনে নতভাবে আসীন রহিয়াছেন। সভার শোভা অতি রমণীয় ও অতুল, যেন সুবিমল নভোমণ্ডলে সংখ্যাতীত কাঞ্চনকান্তি নক্ষত্রের সমাবেশ এবং তন্মধ্যস্থলে অকলঙ্ক শশধর ভুবনমোহনরূপে বিরাজ করিতেছেন।

সভাস্থল নীরব, সভাসদ্বর্গ নিস্তব্ধ। সহসা বস্ত্রাবাসের এক স্থানে একটী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পরিলক্ষিত হইল। সেই

ছিদ্রপথাভ্যন্তর দিয়া সূর্য্যের কিরণ আপতিত হইতে দেখিয়া সভায় সমাগত সাধকবৃন্দের সাতিশয় উৎকণ্ঠার আবির্ভাব হইল। কেননা তাহাতে তাঁহারা ক্লেশানুভব করিতেছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা প্রত্যেকেই তাহা বন্ধ করণার্থ প্রাণপণশক্তিতে বিবিধপ্রকার চেষ্টা ও কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অশেষবিধ যত্ন ও বহু পরিশ্রম করিয়াও সেই সাধন-বল গরীয়ান্ মুক্তাত্মগণের কেহই সফল-মনোরথ হইতে পারিলেন না। আহা, যে ধর্ম্মপন্থা-চির-বিচরণ-শীল তত্ত্ববুদ্ধি কৃতী পুরুষগণ দৈবশক্তি প্রসাদাৎ কত কত উৎকৃষ্ট ও অদ্ভুত কার্য্য অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিয়াছেন, আজ তাঁহারা এই কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়া নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান ভাবে নতশিরে অবস্থান করিয়া রহিলেন। ছিদ্র-পথ কোনমতে রুদ্ধ হইল না। সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, দেখিয়া জগদেক-আশ্রয় পুণ্যপুরুষ হজরত মহম্মদ মস্তফা সকলকে অতি করুণ-মৃদুস্বরে কহিলেন, "হে ইস্লাম-হিত-চিকীর্ষু মহামতিগণ! তোমরা বৃথা চেষ্টা ও বৃথা পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইতেছ কেন? তোমাদের প্রয়াস, তোমাদের যত্ন কোন ফলোপধায়ক হইবে না। আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, যে পর্য্যন্ত না হোসেন মন্সুর স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া আপন মস্তক ছিদ্র-পথ-তলে অর্পণ করিবেন, তদবধি উহা কিছুতেই

অবরুদ্ধ হইবার নহে।” সেই দেবসভায় স্বয়ং মন্‌সুরও এক আসন পরিগ্রহ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি নিখিল-নাথ-বান্ধব নরকুলহিতৈষী হজরতের শ্রীমুখাৎ এবংবিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে সোৎসাহে দণ্ডায়মান হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, “আহা কি অনুগ্রহ! আহা কি স্নেহবাৎসল্য!! প্রভো! এক মস্তক কেন, আজ যদি এই দীনাতিদীনের লক্ষ মস্তক থাকিত, তাহা হইলে প্রভুর নির্দ্দেশ মত এই দণ্ডে এই জগৎ-প্রীতিজনন সেই বিভুর কার্য্যে সাদরে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইতাম। হায় এই বসুন্ধরাতলে এমন সম্মানিত সৌভাগ্যবান পুরুষ কে আছে, যে ব্যক্তি জন্মমৃত্যু-রক্ষণ-ভূত জগদীশ্বরের পথে আত্মজীব-নোৎসর্গ করিয়া পারলৌকিক শ্রেয়ঃ লাভ পূর্ব্বক তদীয় প্রিয় হইতে পারে? যদি প্রণয়ীর জন্য প্রাণ যায়, যদি প্রিয়-ভাজন বান্ধবের বিপদে বিপন্ন হইয়া আত্মবিনাশ ঘটে, তবে তাহা অপেক্ষা শুভাদৃষ্ট ও সুখের বিষয় এ জগতে আর কিছুই নাই। ফলে প্রণয় করার নাম আত্মবলিদান, ইহা আমি বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। যে প্রেমিক আত্ম-বলিদানে অসমর্থ, যে প্রেমিক প্রেম-সঙ্কটে মস্তক ছেদিত হইবে বলিয়া ভয়-বিহ্বল, সে কখন প্রকৃত প্রেমিক নহে, সে ভণ্ড, সে শঠ, সে ছদ্মবেশী স্বার্থপর!” জগদ্‌গুরু হজরত

মহম্মদ মহোচ্চমনা মন্সুরের এইরূপ সদুত্তর শুনিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে তাঁহার অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক ঐশিক প্রেমিকতার ভূরি ভূরি যশোকীর্ত্তন করিলেন।

অকস্মাৎ মন্সুরের নিদ্রাভঙ্গ হইল, জড়তা কাটিল; সঙ্গে সঙ্গে দেবসভাও নয়নের ব্যবধানে পড়িয়া গেল। তিনি জাগরিত হইয়া সে স্বর্গীয় শোভা-সমৃদ্ধি—সে সভ্যগণ-সমাবেশা-

* কবিবরের এই স্বপ্নবৃত্তান্তের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা কোন কোন মহাত্মা এইরূপ করিয়াছেন। স্বপ্নদৃষ্ট বস্ত্রাবাসটী জগৎস্রষ্টার প্রিয়, ও পরম পবিত্র দ্বীন ইস্লাম-ধর্ম্মস্বরূপ (শরিয়ত)। প্রধান স্তম্ভ পয়গম্বর-প্রধান হজরত স্বয়ং, অন্যান্য ধার্ম্মিকগণের সহিত উহা মস্তকে ধারণ করিয়া যত্নে রক্ষা করিতেছেন। সূর্য্যোত্তাপে তপ্ত (অর্থাৎ ধর্ম্মভ্রান্ত) নরগণ ইহার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইলে অর্থাৎ শান্তিপ্রদ সনাতন ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বন করিলে অন্তিমে পরিত্রাণ পাইয়া পরম সুখের অধিকারী হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-বিগর্হিত উক্তি "আনাল হক্" মন্সুর কর্ত্তৃক উচ্চারিত হওয়ায় বস্ত্রাবাসের-(ইস্লাম ধর্ম্মের) এক স্থানে ছিদ্রস্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। ঐ ছিদ্র অবরোধার্থ অনেকে অনেক চেষ্টা করিয়া অর্থাৎ মন্সুরকে "আনাল হক্" বলিতে নিষেধ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। সেই জন্য কথিত হইয়াছে যে, যদবধি হোসেন মন্সুর স্ব-ইচ্ছায় ছিদ্রপথে স্বীয় শির স্থাপন না করিবেন অর্থাৎ শরানিষিদ্ধ "আনাল হক্" উচ্চারণে ক্ষান্ত না হইবেন, অথবা আত্মবিসর্জ্জন না করিবেন, তদবধি উহা অপরের সহস্র চেষ্টায় কিছুতেই রুদ্ধ (তিনি উহা উচ্চারণে কিছুতেই নিবৃত্ত) হইবার নহে।

দির কিছুই আর দেখিতে পাইলেন না! কিন্তু সেই সুর-সভা ও তাহার সভ্যসমিতির ক্রিয়াকলাপ তদীয় হৃদয়-ফলকে প্রতিফলিত হওয়ায় এবং মানস-যন্ত্রে প্রতিঘাত করায়, তিনি তখনও যেন তৎসমুদায়ের জীবন্ত বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। পরন্তু, সচৈতন্য ব্যক্তির এ মোহ—এ মরীচিকাময় ভাব আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? তিনি ক্ষণকাল পরেই শয়ন-কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হা হুতাশ ছাড়িয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দরদর-ধারে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন! হাত নাই। অবশেষে হতাশ-মলিন-মুখে প্রেম-গদ্‌গদ ভাবে পুনর্ব্বার তিনি "হক্—হক্, আনাল হক্" বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মনস্থরের "অহম্-ব্রহ্মবাদিত্বের" কথা দেশদেশান্তরে প্রচারিত হইতে আর বাকি নাই। কিন্তু তিনি আজ প্রশান্ত-ভাবে কারাগৃহে অবস্থান করিতেছেন, এই সংবাদ শ্রবণে চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র লোক দলে দলে আসিয়া কারা-গৃহ-সমীপে সমবেত হইতে লাগিল। বিশাল বোগদাদ নগরস্থ ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণও সেই স্থানে আসিতে ক্রুটি করিলেন না। ফলতঃ কি সংসার-জ্ঞানশূন্য তরলবুদ্ধি বালক, কি কৌতূহলাক্রান্ত বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ, কি স্থিরবুদ্ধি বৃদ্ধ, সকলকেই কোন না কোন প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র হইয়া এই জনতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। সকলেই ক্রোধান্বিত, সকলেরই মনস্থরের প্রতি রোষ-কষায়িত দৃষ্টি। কত জনে কত কথা বলিতেছে; কোলাহলের গম্ভীর ধ্বনি গম্ গম্ করিয়া উঠিতেছে। পরিশেষে কতকগুলি লোক বহু প্রকার তীব্রোক্তি করিয়া মনস্থরের জীবননাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। সেই স্থানে মহর্ষির সহাধ্যায়ী বন্ধু সুধীবর শেখ আবুবকর শিবলীও সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রিয় বন্ধুর আসন্ন বিপদের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া নিরতিশয় শোক-সন্তপ্ত হইলেন এবং সর্ব্বলোক-পূজনীয় মহামনস্বী ধর্ম্মগুরু

সৈয়দ জুনেদ শাহের নিকটে আসিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে সমুদায় নিবেদন করিতে আর ক্ষণবিলম্ব করিলেন না।

জ্ঞানবৃদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য জুনেদ শাহ এই মর্ম্মান্তিক সংবাদে প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন; তাঁহার মুখকান্তি সহসা রূপান্তরিত হইল। অতঃপর, কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কতিপয় ধার্ম্মিক লোকের সমভিব্যাহারে শশব্যস্তে কারাগৃহাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। তিনি তথায় উপনীত হইয়া দেখেন, সংখ্যাতীত লোকের সমাগম হইয়াছে। কি ভয়ানক বিরাট ব্যাপার! সকলের উত্তেজনা ও অভিপ্রায় দেখিয়া শুনিয়া তিনি ভীত হইলেন; কি যে বলিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। অবশেষে সাহসের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক ধীরগম্ভীরে কহিলেন, "হে ইস্লামের ধর্ম্মভীরু প্রিয় সন্তানগণ। হে সমাজের ধর্ম্মশীল পুরুষবর্গ! আপনারা আজ ধর্ম্মের জন্য—ধর্ম্মাবমাননার প্রতি-শোধ লইবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। ইহা ধর্ম্মনিষ্ঠার জ্বলন্ত উদাহরণ,—সমাজের জীবন্ত শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু একটী কথা; বিশেষ-রূপ বিবেচনা না করিয়া কোন গুরুতর কার্য্যে উৎসাহিত ও অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। আমি ভরসা করি, ঈশ্বরেচ্ছায় আপনারা আমার বাক্যে বিরক্ত না হইয়া

ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন। দেখুন, মন্‌সুর অবোধ নহেন; ধর্ম্ম-কর্ম্মে তাঁহার যথেষ্ট আস্থা ও অচলা ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইস্‌লাম-সম্মত ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদনে তাঁহার কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। তবে একটী কথার নিমিত্ত আজ আপনারা তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন—হইবারই কথা। যেহেতু প্রদীপ্ত হুতাশন-সন্তাপে পদার্থমাত্রেই উত্তপ্ত হইয়া থাকে। আবার যদি সেই অগ্নি নিস্তেজ বা একেবারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তবে তাবৎ বস্তুরই শীতলতা সম্পাদন হইতে দেখা যায়। তাই বলিতেছি, মন্‌সুর যদি সেই কোপোদ্দীপক বাক্যোচ্চারণে চিরবিরত থাকেন, তবে কি তিনি ক্ষমার পাত্র নহেন? দোষ মনুষ্যেই করিয়া থাকে, ক্ষমাও মনুষ্য-হৃদয়ের এক অদ্বিতীয় মধুর গুণ! তাই বলিতেছি,—আপনারা অবশ্যই শান্ত ভাব অবলম্বনে তাঁহার অপরাধের মার্জ্জনা করিবেন। আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তাঁহার রসনা হইতে শরা-বহির্ভূত নিষিদ্ধ বাক্য আর কদাপি বহির্গত হইবে না। ইহা বলিয়া সৈয়দ সাহেব মন্‌সুরের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং প্রীতিপূর্ণ-বচনে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "একি! মন্‌সুর সহসা তোমার ঈদৃশ চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল কেন? কোন্ ঘটনায় তোমার বাগিন্দ্রিয়কে এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ন্যায়বিরুদ্ধ নিন্দিত বাক্য

স্ফুরণে বাধা করিয়াছে? স্থিরভাবে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া বল।” তখন ধর্ম্মোন্মত্ত মন্‌সুর, “আমার এক মুহূর্ত্তেরও অবসর নাই, আমাকে একটু অবসর দিউন,” ইহাই বলিয়া অপ্রসন্নভাবে অন্য দিকে বদন ফিরাইলেন। তদ্দর্শনে সৈয়দ সাহেব কথঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “মন্‌সুর! তুমি এবংবিধ বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ কর, ভয়ানক পাপ-কথা আর মুখাগ্রে আনিও না, প্রকৃতিস্থ হও। তোমার এ শ্রবণকঠোর পাপময় বাক্যে— বৃথাভিমানে জগৎ সন্তুষ্ট নহে। যে দাবি মানবকুলে কেহ কখন করে নাই, করিবারও সামর্থ্য নাই, যে কথা কর্ণেও কেহ শুনে নাই, আবালবৃদ্ধবনিতা যাহাতে মহাপাপ অর্শে বলিয়া জ্ঞান করে, এক জন কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খও যে কথা শুনিলে সঙ্কুচিত ও ভয়বিহ্বল হয়, আজ তুমি এক জন ক্ষণভঙ্গুর সসীমশক্তি ক্ষুদ্র মানব হইয়া তদুচ্চারণ করিলে— ধর্ম্মের অবমাননা করিলে, মনুষ্য সমাজ কোনক্রমেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। আমি তোমার উপদেষ্টা ও মঙ্গলার্থী। তোমার অমঙ্গল ঘটিলে আমার যাদৃশ কষ্ট অনুভব হইবে, তাদৃশ আর কাহারও হইবে না। অতএব স্থির হও, আমার কথা শ্রবণ কর, সুবিমল সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিও না—বিঘ্ন ঘটাইও না। অন্যথা তোমার

ঈশ্বর-প্রেমিকতা—ধ্যান-ধারণা কোন ফলোপধায়ক হইবে না, তুমি পরিশ্রমের পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, শিক্ষার অসহ্য গুরু ভারে তোমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি জন্মিয়াছে। তুমি দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় প্রকৃত পথ হইতে অপসৃত হইয়াছ—তোমার চিরলক্ষ্য প্রেমপথ ভ্রষ্ট হইয়াছ। জলভ্রমে তরঙ্গায়িত মরীচিকার দিকে ধাবিত হইয়াছ। এখনও বলিতেছি, যদি কল্যাণ কামনা কর, সুপথে আইস। ইহা তুমি বিলক্ষণ জান যে, আল্লাহ্ মহান্, সর্ব্ব শক্তির আধার, অক্ষয় অদৃশ্য পুরুষ। তাঁহার সদৃশ কেহ বা কিছুই নাই। তাঁহার দান বা সৃষ্ট মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, সিন্ধু, সরিৎ, পর্ব্বত, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, শূন্য, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা প্রভৃতি। তবে বল দেখি, সেই মহিমাময় মহাদাতার দাবি করা—তৎস্থানীয় হইতে যাওয়া, রক্তমাংসময় অচির-দেহধারী সংকীর্ণশক্তি মনুষ্যের পক্ষে কোনক্রমে শোভা পায় কি? আর যদি তুচ্ছ এরূপ কথন কখন যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়ানুমোদিত হইত, তাহা হইলে নরের অনন্ত-শরণ প্রেরিত পুরুষ-প্রভাকর মহামান্য হজরত মহাম্মদ মোস্তফা "শেরেকী" করা অর্থাৎ খোদাতালার অংশী-স্থাপন করা বা তত্তুল্য জ্ঞান করাকে মহাপাপ বলিয়া কদাচ নিষেধ করিয়া যাইতেন না। তিনি পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষগণের অগ্রগণ্য পূজনীয়

ও সংখ্যাতীত নক্ষত্রের মধ্যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃপূর্ণ অকলঙ্ক শশধর স্বরূপ। আহা! যে চন্দ্রের নির্ম্মল আলোকে অখিল বিশ্ব আলোকপ্রাপ্ত, পবিত্র কোরাণের বিধি এবং তাঁহার আজ্ঞা অবহেলন করা কত দূর ন্যায়বিবর্জ্জিত ও দূষণীয় কার্য্য, তাহা কি তুমি এখন বুঝিতে পারিতেছ না? তাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, যদি বুদ্ধিমান হও, অবিলম্বে এই পথ পরিত্যাগ কর; মহাপুরুষের পথানুসরণ করিয়া আত্ম-কল্যাণে রত থাক।”

এতচ্ছ্রবণে সাধক মনস্থর উন্নতশীর্ষে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বিরক্তি সহকারে স্বীয় দীক্ষাগুরু সৈয়দ জোনেদকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিলেন, “আপনি কেন আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? আপনার বচনপরম্পরায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রেমের মাহাত্ম্য এখনও আপনি বুঝিতে সমর্থ হন নাই, ইহার সুমধুর রসাস্বাদনে আপনি বঞ্চিত আছেন। যদি প্রেমতত্ত্বে আপনার অণুমাত্রও অধিকার থাকিত, তাহা হইলে আজ আমার প্রতি কঠিন কুলিশোপম হৃদয়-বিদারী বাক্যবাণ বর্ষণে উদ্যত হইতেন না। আর বলুন ত, পয়গম্বরপ্রবর হজরত মহাম্মদ সম্বন্ধে আপনি কি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন? তাঁহার ইঙ্গিতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা সাতিশয় কঠিন ব্যাপার। তিনি

বলিয়াছেন "খোদা সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছেন;" এবং ধর্ম্ম-গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে, "আমি (সৃষ্টিকর্ত্তা) মনুষ্যের নিকট হইতেও অতি নিকটে আছি।" এক্ষণে বলুন দেখি, আপনি ইহার কিরূপ মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন? আপনি প্রকাশ্য কার্য্য-কলাপে, বাহ্য অনুষ্ঠানে, লৌকিক আচার-ব্যবহারে বিশেষরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু বলুন ত, চাকচিক্য-ময় বহির্ভাগ দেখিয়া ভিতরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায় কি? শুদ্ধ বাহ্য আড়ম্বরে কিছুই হইবে না, অন্তর ও বাহির উভয় একই কেন্দ্রাভিমুখী হওয়া চাই! যেমন কোন পাত্রের অন্তর ও বহির্ভাগ সম্যক্ পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত হইলে স্বতই উহা দর্শকের ভক্তি ও শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শাস্ত্রোক্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয়বিধ ধ্যান-ধারণার সমতা রক্ষা করিতে পারিলে সেই বিশ্বকল্পতরু মহিমাময় মহীপতি স্বয়ং প্রসন্নচিত্তে ভক্তকে অমৃতরসাভিষিক্ত মধুর ফল প্রদান করেন, নতুবা নহে। তুলাদণ্ডের এক দিক ভারাক্রান্ত করিলে দণ্ড কোন্ কালে সমভাবে সরল পথে দাঁড়াইয়া থাকে? আহা! পবিত্রতম স্বর্গীয় গ্রন্থ কোরাণ শরিফে যে অভিপ্রায় সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত রহিয়াছে, আপনার হৃদয়-ক্ষেত্রে তাহার ছায়ার লেশমাত্রও নিপতিত হয় নাই। তবে আপনি কেমন করিয়া প্রেরিত পুরুষের প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিলেন?

স্বাদ গ্রহণ না করিয়া কোন বস্তু মিষ্ট, তিক্ত বা কষায়, তাহা বলিতে পারা যায় কি? নিজে ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে অক্ষম হইয়া অপরকে প্রকাশ্যে ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া অপবাদ দেওয়া জ্ঞানবান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ বৃথা বাদানুবাদে কোনও সুফল সমুদ্ভূত হয় না। কি জন্য আমি ধর্ম্ম-পথভ্রষ্ট হইলাম, বিশেষরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক সর্ব্ব সমক্ষে আপনি তাহার শাস্ত্রসম্মত উত্তর প্রদান করুন। আমি যাহা করি, তাহাই উৎকৃষ্ট, তাহাই খোদাতালার অনুমোদিত ও যুক্তিযুক্ত কার্য্য, এরূপ বোধ করা কদাচ ভাল নহে—ভ্রান্তমতি স্বল্পধী মানবের পক্ষে সঙ্গত নহে। আপনার পথ সরল কি বক্র, অগ্রে তাহার অবধারণ করা কর্ত্তব্য। কে না জানে, এ সংসারে সত্যপথ কণ্টকময় ও বিপজ্জনক এবং তাহাতে বিবিধপ্রকার প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইয়া থাকে? হায় আজ আমাকে ন্যায়ের অনুরোধে বলিতে হইল যে, সে পথের পথিক হইতে আপনি অসমর্থ; তাহাতে অনেক সৌভাগ্য, অনেক সহিষ্ণুতা, অনেক সম্বলের প্রয়োজন। আপনার সে সম্বল কৈ? ঈশ্বরের প্রকৃত একত্ব বিষয়ক জ্ঞানের অধিকার আপনার কোথায়? আপনার অন্তরে প্রণয়ের ভীষণ প্রতিবন্ধক স্বরূপ লক্ষাধিক সুদৃঢ় যবনিকা প্রলম্বিত, সুতরাং সেই প্রেমময় নিখিলনাথের নির্ম্মল প্রেম লাভ

করিয়া অপার্থিব অনন্ত সুখে সুখী হইতে পারিবেন কিরূপে? আপনার জ্ঞাননয়ন প্রস্ফুটিত হইবার এখনও বিলম্ব আছে।"

উন্মত্ত আত্মহারা মন্‌সুর মনের আবেগে জলদগম্ভীরে এতদূর বলিয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল জলধি সহসা যেন স্থির,—তরঙ্গ-রহিত হইল। তখন সৈয়দ সাহেব তাঁহার ঈদৃশ স্পর্দ্ধা সম্বলিত তেজস্কর বাক্য শ্রবণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। চিত্রপুত্তলিকাবৎ ক্ষণকাল নীরব ও নিস্পন্দ। অতঃপর আর বাক্য ব্যয় বৃথা জানিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই ঘটনায় সাধারণে ক্রোধে অধিকতর উত্তেজিত ও অধীর হইয়া উঠিল। "মৃত্যুকালে বিপরীত বুদ্ধি ঘটে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না; সে লক্ষণ মন্‌সুরের যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। এখন হিতগর্ভ উপদেশ বা প্রবোধ প্রদান, ইহার কিছুই ফলোপধায়ক হইবে না। স্বয়ং পূজ্যপাদ শিক্ষাদাতা যখন কুশল সাধন করিতে গিয়া অপদস্থ ও নৈরাশ্য-সন্তপ্ত হইয়া প্রস্থানপর হইলেন, তখন আর ইহার মঙ্গল কোথায়?" এইরূপ নানা জনে নানা কথার উত্থাপন করিয়া তাঁহার প্রাণসংহারের নিমিত্ত অধৈর্য্য ও আগ্রহাতিশয্য দেখাইতে লাগিল। কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত ফতুয়া অর্থাৎ বিধান

ব্যতিরেকে এক জনের প্রাণদণ্ড কিছুতেই হইতে পারে না। এই নিমিত্ত কয়েক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত-পটল-সূর্য্যস্বরূপ মহামান্য ব্যবস্থাপক সৈয়দ জোনেদ শাহের নিকটে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিধেয় বিবেচনায়, তৎসকাশে উপনীত হইয়া ব্যবস্থা-প্রার্থী হইলেন। জোনেদ শাহ্ মন্সুরের ব্যবস্থার কথা শুনিয়া নিস্পন্দ ও নিরুত্তর। সেই জ্ঞানবৃদ্ধের দুই চক্ষু হইতে গণ্ডস্থল বহিয়া অবিরল ধারে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; তাঁহার শোক-সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া সহস্র ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদুপরি আবার দীর্ঘ নিশ্বাস-ভীম-বাত্যাঘাতে তদীয় অন্তরাত্মা যে কিরূপ নিদারুণভাবে আলোড়িত হইয়াছিল, তাহা তদবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অপরের বোধগম্য নহে। ফলতঃ তিনি যে অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগী মহাত্মা মন্সুরের আসন্ন বিপদে মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ব্যবস্থাপ্রার্থীরা সৈয়দ সাহেবের অবস্থা অবলোকনে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও তাঁহার ব্যবস্থা-প্রদান-অভিরুচিজ্ঞাপক কোন ভাবই লক্ষিত হইল না— একটী বাক্যও স্ফুরিত হইল না। তিনি কেবল নীরবে কাতরভাবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে ব্যবস্থাপ্রার্থী ব্যক্তিগণ সাতিশয় বিরক্ত হইলেন। কাহার কাহার

ধৈর্য্যচ্যুতিও ঘটিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? নানা কারণে সে অধৈর্য্যবেগ সম্বরণ করিতে হইল। অবশেষে রাজ্যাধিপতি ধর্ম্ম-প্রতিনিধি মহামান্য খলিফাকে জানাইলে সহজেই ইহার প্রতীকার হইবে—বিনানুরোধে শীঘ্র ব্যবস্থা হস্তগত হইবে, এই আশায় সকলে সমবেত হইয়া খলিফার দরবারে উপনীত হইলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা যথাবিধি তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন। দরবারের বিচার-কার্য্যে নিয়োজিত জনৈক সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী মনে মনে এই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিয়া ইস্‌লাম-সমাজপতি মহামান্য খলিফাকে কহিলেন, "এই দুরূহ কার্য্য, কার্য্যে পরিণত করিবার অগ্রে পূজ্যপাদ সৈয়দ জোনেদ শাহের ব্যবস্থা লওয়া কর্ত্তব্য বটে। যেহেতু তিনি দরবেশকুলের শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের গুরুস্থানীয়, তিনি যে ব্যবস্থা প্রদান করিবেন, তাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত ও শিরোধার্য্য। কিন্তু তিনি ব্যবস্থা না দিলে ভয়ের কারণ আছে।"

খলিফা প্রজারঞ্জক, ন্যায়বান ও নিতান্ত ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শাসনশৃঙ্খলা ও সুবিচারের ত কথাই নাই, কিন্তু সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের দিকে সতত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকায় ঈশ্বরানুগ্রহে তদীয় সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য মধ্যে ধর্ম্মবহির্ভূত কোন একটী সামান্য কার্য্য সংঘটিত হওয়া দূরে থাকুক, একটী বাক্যও উচ্চারিত হইতে পারিত না। কিন্তু আজ তাহার বিষম বৈপরীত্য

সন্দর্শনে তিনি সাতিশয় মর্ম্মাহত, বিস্মিত, বিচলিত ও চিন্তাকুল হইলেন। অজ্ঞান—সাধারণ ব্যক্তি হইলে ভাবিবার এত অধিক প্রয়োজন ছিল না বটে, পরন্তু এ যে সে ব্যক্তি নহে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশারদ পরমজ্ঞানী মন্সুরের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের অভিযোগ! কি সর্ব্বনাশকর ঘটনা!! ইহা যে ভাবিবারই ক্ষেত্র। বিশেষতঃ ধর্ম্মাধিকরণে উপবিষ্ট হইয়া আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক ন্যায়-সম্মত কার্য্য করাই যথার্থ সুবিচারক ও সর্ব্বলোকে প্রশংসিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। যিনি তাহাতে অক্ষম, সেই দুর্ব্বলচেতা মানব ধর্ম্মজগতের পরিরক্ষক পদবাচ্য নহেন, তিনি সুবিচারক ও প্রশংসার্হ বলিয়া পরিকীর্ত্তিতও হইতে পারেন না। এই ধারণা বশতই বিচক্ষণ খলিফা চিন্তাবিহ্বলচিত্তে অর্থীপ্রত্যর্থী স্বরূপে মনে মনে বহু বাদানুবাদ ও বিবিধ তর্কবিতর্ক করিলেন। পরিশেষে বুঝিলেন, ধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাব খর্ব্ব করণে-উদ্যত মন্সুর দণ্ডের যোগ্য বটেন। তখন রাজকর্ম্মচারীর কথা যুক্তি-মূলক বিবেচনা করিয়া ধর্ম্ম-পরিরক্ষণার্থ ব্যবস্থা প্রদান জন্য তিনি পণ্ডিতপ্রবর শাহ জোনেদকে অনুজ্ঞা পত্রপ্রেরণে বাধ্য হইলেন। কহিলেন, "মহাত্মন্! উন্মত্ত মন্সুর সুনির্ম্মল ইস্লাম-ধর্ম্মে যে কি ভয়ানক দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা প্রলেপন করিতে,—চিরন্তন সরল বিশ্বাসের মূলে সুতীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন, তাহা আর আপনার অবিদিত

নাই। আজ ইস্লাম-সমাজ তাঁহার সেই কৃতাপরাধের,—সেই ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিবিধান করিতে বদ্ধপরিকর। আপনি ধর্ম্মবিৎ এবং পণ্ডিতকুলের শীর্ষস্থানীয়, আপনার ধর্ম্মভীরুতা চিরপ্রসিদ্ধ। ধর্ম্মের অবমাননা আপনার হৃদয়ে বিষদিগ্ধ বাণের ন্যায় যাতনা প্রদান করে। অতএব আশা করা যাইতে পারে যে, মন্সুরের এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত শাস্ত্রানু-মোদিত যে ব্যবস্থা হয়, তাহা প্রদান করিয়া সত্য সনাতন ইস্লাম-ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে আপনি ত্রুটি করিবেন না। অঙ্কুরে মূলোৎপাটিত না করিলে, কালে ইহা শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট হইয়া ধর্ম্মজগতে নিদারুণ বিপ্লব সমুপস্থিত করিতে পারে, আপনার ন্যায় ভবিষ্যদ্দর্শী ব্যক্তিকে একথা লেখাও বাহুল্য মাত্র।" লেখা সাঙ্গ হইল, অভিযোক্তাগণ যথারীতি নম্রতার সহিত সিংহাসনপদপ্রান্ত চুম্বন করিয়া লিপি গ্রহণ করিলেন। আনন্দের সীমা নাই, লিপি পাইয়া কোলাহল করিতে করিতে জনস্রোত চলিল; অনন্তর ব্যস্ততার সহিত যাইয়া সেই পত্র মাননীয় জোনেদ শাহের হস্তে অর্পণ করিল। সকলে "ফতুয়া" প্রাপ্তির আশায় দণ্ডায়মান, সতৃষ্ণ নয়নে ফতুয়া-দাতার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে শাহ কিন্তু পূর্ব্ববৎ নীরব, নিরুত্তর ও কাতর-ভাবাপন্ন। তিনি প্রথমতঃ সম্মাননার সহিত খলিফা প্রদত্ত পত্রিকা খানি গ্রহণ ও চুম্বন করিলেন।

অতঃপর পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি বেদনা-ব্যঞ্জক ব্যাপার! পাঠমাত্র তাঁহার বিষাদসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, দর-বিগলিত অশ্রু-ধারে লিপি অভিষিক্ত হইয়া গেল। আগন্তুকেরা ব্যবস্থাদাতার এই লক্ষণ তাঁহাদের আশাপ্রদ নহে দেখিয়া, কিছুক্ষণ পরে পুনর্ব্বার খলিফার সমীপে যাইয়া আবেদন করিলেন। তিনিও বিরক্ত না হইয়া "ফতুয়ার" জন্য পুনঃ অনুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন। এইরূপে ছয় বার যাতায়াত হইল, তথাপি ফতুয়া হস্তগত হইল না। ব্যবস্থাদাতার মনের ভাব পূর্ব্বের ন্যায় অপরিবর্ত্তিত, অচল ও অটল। হাঁ কিংবা না, ইহার কোন কথাই তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইল না। কিন্তু ধৈর্য্যশীল ব্যবস্থাপ্রার্থীরাও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা সপ্তমবারে যখন মহামান্য খলিফার নিকট হইতে পত্র লইয়া শাহ-সন্নিধানে উপনীত হইলেন, তখন তিনি নিজেও বিষম বিরক্ত হইলেন এবং বারংবার রাজাজ্ঞা অবহেলন বা প্রত্যাহার করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। যদি করেন, তাহা হইলে সাধারণের অপ্রিয়ভাজন, দেশ-বিদেশে নিন্দিত ও খলিফার কোপদৃষ্টিতে পড়িলেও পড়িতে পারেন। বিশেষ পবিত্র "শরাকে" অক্ষুণ্ণ ও গৌরবান্বিত রাখাও সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, মনোমধ্যে এইরূপ অশেষবিধ চিন্তার আবির্ভাব হওয়ার পরিশেষে বাধ্য হইয়া ব্যবস্থা প্রদান

করিতে সম্মত হইলেন। তখন তিনি শাস্ত্রানুসারে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করতঃ (অজু করিয়া) পবিত্র হইয়া সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন জগন্নিদান জগদীশ্বরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক প্রথমতঃ সুফির সজ্জা (আধ্যাত্মিক পরিচ্ছদ) পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব পোষাক পরিধান করিলেন। পরে চিন্তিতচিত্তে লেখনী গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে একমাত্র উপাস্য বিশ্বস্রষ্টার মহান্ নামের মহত্ব পরিকীর্ত্তন করিলেন, পরে লিখিলেন, "যে ব্যক্তি নির্ব্বিকার নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ অদ্বিতীয় জগৎস্রষ্টার অংশী স্থাপন করে—ঈশ্বরত্বের দাবি করে, সে ধর্ম্মদ্রোহী, ইস্‌লামবিরোধী মহাপাপী। নিরপেক্ষ মহাম্মদীয় বিধানানুসারে যদি ইহার প্রকাশ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তবে তাহার শিরশ্ছেদন দণ্ডই প্রশস্ত প্রায়শ্চিত্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।" সৈয়দ-সাহেব এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতঃ আগন্তুকদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা ব্যবস্থা পাইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক মহানন্দে কোলাহল করিতে করিতে আপনাদের গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ব্যবস্থা হস্তগত হইয়াছে, মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে ; নগর-বাসীদের আর আনন্দের সীমা নাই। আজ মন্সুরের প্রাণ-দণ্ডের দিন। তাই দলে দলে লোক আসিয়া এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমবেত হইতে লাগিল। ধনী মধ্যবিৎ দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ যুবক, পণ্ডিত শিক্ষার্থী মূর্খ, মূক খঞ্জ বধির,—কেহই স্থির নহেন, সকলেই চলিয়াছেন, নদী-স্রোতের ন্যায় মনুষ্য-স্রোত চলিয়াছে। রাজপথ জনতাপূর্ণ—কোলাহলময় ; কল্ কল্ শব্দে সমগ্র বোগদাদ নগর শব্দায়মান, আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত—গম গম করিতেছে। সহস্র সহস্র নরকণ্ঠ-স্বর একত্র সংমিশ্রিত হইয়া এক গম্ভীর শব্দ উৎপাদন করিতেছে। দূর হইতে সেই শব্দ অধিকতর ভীষণ ও গম্ভীর অনুমিত হই-তেছে। কত জনে কত কথা বলিতেছে। কত বাক্‌বিতণ্ডা, কত শ্লেষবিদ্রূপ, কত পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইতেছে। কেহ উৎফুল্ল নয়নে "তামাসা" দেখিবার জন্য খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া বেড়াইতেছে, কেহ বা বিষণ্ণচিত্তে, নীরবে সমবেত মানব মণ্ডলীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কেহ কেহ বা "হা হতভাগ্য মন্সুর! শেষে তোমার ভাগ্যে এই

ছিল” বলিয়া অবশাঙ্গে বসিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। কেহ বা বলিল, “ধর্ম্মবিদ্রোহীর কঠিন শাস্তি হওয়াই উচিত, তাহাতে কাহারও ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই।”

মন্‌সুরের সহাধ্যায়ী তাপস-প্রবর শেখ আবুবকর শিবলী মহোদয় এই দৈব দুর্ব্বিপাকে সমধিক মর্ম্মাহত ও বিষণ্ণ। তাঁহার হৃদয়ে যেন পাষাণ পিষিয়া যাইতে লাগিল। যদি কোন প্রকারে এই বিপত্তির নিরাকরণ করিতে পারেন, যদি কোন কৌশলে মন্‌সুরের মনের গতি ফিরাইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া তিনি শশব্যস্তে কারা-গৃহে মন্‌সুরের সমীপস্থ হইলেন এবং বহুবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করার পর প্রবোধ বাক্যে দুঃখিত ভাবে কহিলেন, ভ্রাতঃ! জানিয়া শুনিয়া আপনার প্রাণ আপনি বিসর্জ্জন করিতে চলিলে! ইহা কি তোমার ন্যায় সুপণ্ডিত সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির অনুরূপ কার্য্য? যে হৃদয় সুদৃঢ় নগরাজ সদৃশ অটল ও অদম্য ছিল, আজ তাহা সহসা বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত হইল কেন? কোন্ সূত্রে কোথা হইতে এই চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়া তোমাকে ঈদৃশী অবস্থায় পাতিত করিয়াছে? তোমার সেই অবিচলিত অধ্যবসায়, সেই অমানুষিক সহিষ্ণুতা, সেই দেব-দুর্লভ ইন্দ্রিয়-সংযমন, সেই প্রখর বিবেকবুদ্ধি আজ কোথায়? গুরূপদেশের কি এই পরিণাম? নির্জ্জনধ্যান-ধারণা, অসামান্য

শাস্ত্রাভিজ্ঞতা শেষে কি অজ্ঞানতায় পর্য্যবসিত হইল? এক ব্যক্তি যাহা সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু জগৎ অসত্য ও অন্যায় জ্ঞানে ঘৃণা, নিন্দা ও বিপক্ষতা করিয়া থাকে, এবংবিধ কার্য্য হইতে নির্লিপ্ত থাকাই শ্রেয়ঃ। তোমার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কথাও কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে? কিন্তু তথাপি বন্ধুত্বের ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতেছি, তোমার উচ্ছৃঙ্খলা উর্দ্ধগা প্রবৃত্তিকে সংযত কর, আলোড়িত চিত্তকে সুস্থির কর। এখনও নিরস্ত হও, রসনাগ্রে সেই অবৈধ উক্তিকে আর প্রবেশাধিকার দিও না, স্মৃতি হইতে সেই বিঘ্নকরী স্মৃতিমূল উন্মূলিত করিয়া ফেল; দেখি, কোন্ ব্যক্তি তোমার প্রতিকূলে আর বাক্যমাত্র ব্যয় করিতে অগ্রসর হইতে সাহস করে? এই যে সমবেত অগণ্য নাগরিক তরঙ্গোচ্ছ্বাসিত দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধুসম রোষকষায়িত-লোচনে তোমার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত,—তোমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত, দেখিবে, এই মুহূর্ত্তেই তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সাদর সম্ভাষণে তোমাকে হিতবান্ বন্ধু জ্ঞানে আলিঙ্গন করিবে। তাই বলিতেছি, ভাই! শান্ত হও ধৈর্য্য ধারণ কর। হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করিতে সচেষ্ট হও।"

বাক্যস্রোত রুদ্ধ হইল। মন্‌সুরের কর্ণকুহরে উহা প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু মনোমধ্যে ক্ষণকালের জন্যও স্থানলাভ করিতে সমর্থ হইল না। বিজনারণ্যে রোদনের ন্যায় তাহাতে

কোনও ফল দর্শিল না। দর্শিবেই বা কি প্রকারে? যখন প্রেমোদ্দীপ্ত মোহাভিভূত পতঙ্গ অকৃত্রিম প্রেমাবেশে ক্ষিপ্ত হইয়া সমুজ্জ্বল দীপশিখা আলিঙ্গন করিতে প্রধাবিত হয়, তখন যে, পতনমাত্রই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে, তাহার সে আশঙ্কা বা সে জ্ঞান কি থাকে? কখনই নহে। সেই জন্যই, এই আসন্ন বিপদেও চিন্তার লেশমাত্র নাই, হাসিতে হাসিতে অম্লান বদনে মন্‌সুর উত্তর করিলেন, "দয়ার্দ্র সখে! সমস্তই বুঝিয়াছি, সমস্তই জানি। কিন্তু আর গভীর অনুশোচনায় বা তীব্র তিরস্কারে ফল কি? তোমার উপদেশরূপ অঙ্কুশ প্রহারেও আমার উন্মত্ত মনমাতঙ্গ বারণ মানিতে চাহে না। আমি যে সেই জন্মমৃত্যুনিয়ন্তা, ভাগ্যলিপি-প্রণেতা মহান্ আল্লার নামে জীবনোৎসর্গ করিয়াছি!! প্রাণের প্রতি আর মায়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই, সমস্তই বিদায় দিয়াছি,—চির বিদায় দিয়াছি। আর ভয় কিসের? কাহার ভয় করিব? হৃদয় পাষাণ করিয়াছি। হউক শত বজ্রপাত, এ হৃদয় পাতিয়া দিব!! ভাই! আমি প্রেমময়ের প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত—উত্তাল তরঙ্গ-তাড়নায় হাবুডুবু খাইতেছি, উঠিবার সামর্থ্য নাই। এ সমুদ্র অপার, অসীম, অনন্ত, অতলস্পর্শ। দিক্‌হারা—যে দিকে তাকাই, ধূ ধূ ধূ করিতেছে। হায়, অশেষ যত্নে অন্বেষণ করিয়াও ইহার তীরভূমি পাইবার উপায় নাই।

ফলতঃ বিপদের ভ্রূকুটিতে আমি শঙ্কিত নহি। কারণ শান্তি এবং সুখ উভয়ই আমার পক্ষে তুল্য। সখে! আমি ত জীবনী-শক্তিরহিত জড়পিণ্ড!! আমি ত মৃত! কি আশ্চর্য্য, মৃত ব্যক্তিকে মরিতে হইবে বলিয়া কি পুনঃ ভয় প্রদর্শন করিতে হয়? মরার উপর খাঁড়ার প্রহার মূর্খের কার্য্য—নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্ব্বাচীনের প্রস্তাব! ভাই! তোমরা আর আমাকে মনসুর বলিয়া ডাকিও না—জানিও না। আমি এখন আর মনসুর নহি। আমার আমিত্ব আছে কোথায়? প্রেমময়ের সত্বায় আমার আমিত্ব বিমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, আকাশ পাতাল এক হইয়াছে। একাকার! একাকার!! একাকার!!! অগ্রপশ্চাৎ, দক্ষিণ বাম, ঊর্দ্ধ-অধঃ যে দিকেই নেত্রপাত করি, একাকার দেখিতেছি। এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। যদিও সংপ্রতি আমি মনসুর নামে অভিহিত, কিন্তু সেই এক হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহি! আমার এই শরীরে সেই অদ্বিতীয়ের ঐশ্বর্য্য গুপ্ত নাই, ও এই নামে তাঁহার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য অপ্রকাশ নাই! হায় হায়, বাহ্য দৃশ্য দেখিয়া জগৎ বিমোহিত। আভ্যন্তরিক মধুর ভাব দেখিতে জগতের চক্ষু নাই, অথবা অসমর্থ। কাহারও কি চক্ষু নাই? কেহই কি এ স্পৃহণীয় গুপ্ত রহস্যোদ্ভেদ করিতে সমর্থ নহে? সুগভীর রত্নাকর গর্ভস্থিত মহামূল্য মুক্তা উত্তোলন করিতে ক্ষমবান ডুবারি কি

একেবারেই ফিরল? অথবা হইতে পারে, এ তত্ত্ব জগৎ অনবগত! কিন্তু আর বিলম্ব নাই; শীঘ্রই এ কথা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইবে, জগতের নর-নারীর কাণে বাজিবে,—চক্ষুষ্মান প্রেমিকগণের নিকটে এ দৃশ্য প্রকাশিত হইবে। অচিরে আমি আত্ম-বলিদান দিয়া আপনাকে নাস্তিত্বে পরিণত করিব, তাঁহার প্রেমে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া সুখদ নবজীবন সহ চিরস্থায়ী অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইব। আহা! প্রেমে যে ব্যক্তি পরিপক্ক—দক্ষ, প্রেমের প্রতিচ্ছায়া—প্রেমের অবস্থা তাঁহাতে পতিত ও প্রকাশিত হইবেই হইবে। যে বর্ণে বস্ত্র রঞ্জিত করিতে হইবে, বস্ত্রে তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলে সেই বর্ণ কি তাহাতে প্রতিফলিত হয় না? ভাই শিব্‌লি! বল দেখি, আমি কি পৃথিবীতে সত্য গোপন করিতে আসিয়াছি? আর সত্য-গোপন করিবই বা কেমন করিয়া? সত্য-গোপনে যে মহাপাপ। অন্তরে যে ভাব, মুখে তাহা ব্যক্ত যে না করে, সেই কপট কুক্কুরের দয়াময়ের দ্বারস্থ হইবারও অধিকার নাই। আমার অচিরস্থায়ী দেহের পতন হয়, হউক। ক্ষতি কি? তাহার সুখসাধনোদ্দেশে এই পাপে অবিনশ্বর আত্মাকে কলুষিত করিতে আমি সম্মত নহি। আমি কখনই এই সত্য প্রচারে পরান্মুখ হইব না; কাহার কথা শুনিব না, কোনও প্রতিবন্ধক মানিব না। তাহাতে জগৎ শত্রু হয়,

হউক; সমাজ যে শাস্তি দিবেন, দিউন; অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ বা একটীও প্রতিবাদ করিব না। তাই বলিতেছি—

প্রিয় সখে!
প্রাণপণে অতি করিয়া যতন,
কি আর অধিক বুঝাবে বল;
বুঝিবার যাহা বুঝিয়াছি তাহা,
তার চেয়ে নাই বুঝিতে বল।

১

শাস্ত্রমহাসিন্ধু করি আলোড়ন,
সহস্র প্রমাণ কর প্রদর্শন,
অশেষ যুকতি, প্রবোধ-ভারতী,
অথবা দেখাও প্রাণের ভয়—
সব অকারণ, বুঝিবে না মন,
কিছুতেই কিছু হবে না ফল।

২

সুদৃঢ় কঠিন করিয়াছি হিয়া,
পড়ুক অশনি ভীম গরজিয়া,
অনা'সে লইব এ বুক পাতিয়া,
যতই যাতনা হোক রে তায়—

যথা হিমাচল, স্থির অবিচল,
তথা রবে মন চির অটল।

৩

দেখে হাসি পায়, হায় কি অজ্ঞান!
(এরা)—গিরি-পাদমূলে করি অবস্থান,
শৃঙ্গবাসী জনে লোষ্ট্র নিক্ষেপণে,
নীচে নিপাতিত করিতে চায়!!
রবি-শশী-তারা নামে কি হে ধরা?
নামে কি ভূতলে জলদদল?

৪

সাধকের আঁখি করিয়া বিকাশ,
দেখ দেখি চেয়ে তব চারি পাশ!
গ্রহ, উপগ্রহ, শূন্য, গন্ধবহ,
অনল, সলিল, ভূধরচয়—
তিনিময় সব, তিনিময় ভব,
তিনিই বিটপী, তিনিই ফল।

৫

পুষ্পরূপে আহা তিনিই প্রকাশ,
তিনিই অম্বরে বিজলীর হাস,
ঝটিকা উচ্ছ্বাস, মরুভূর ত্রাস,

তিনিই আঁধার আলোকময়—
প্রকাশ্য-গোপন, নব পুরাতন,
আদি মধ্য অন্ত তিনি কেবল।

৬

অলি ছলে তিনি নিজ গুণ গান,
কুলিশে অতুল প্রতাপ জানান,
ভূমির কম্পনে জাগ্রতে চেতনে,
উল্কাপাতে কহে হইবে লয়——
করুণ কঠোর, তিনি সর্ব্বতর,
বুঝেনাক ইহা অবোধদল।

৭

(আমি) বিচ্ছেদ-পরদা ফেলিছি ছিঁড়িয়া,
জানিনা কিছুই দ্বিতীয় বলিয়া,
এক আমি সেই, ভিন্ন কিছু নেই,
নিরখে নিয়ত নয়ন দ্বয়——
ইহ-পরকাল হয়েছে মিশাল,
একাকার ধরা পাতাল-তল।

৮

এক(ই) আমি দেখি, দ্বিতীয়-দেখিনা,
এক বিনা দুই জানিনা-মানিনা,

একে আমি ডাকি, একে খুঁজে থাকি,
একেই হৃদয় ডুবিয়া রয়———
ইথে যা তা হবে, সবি প্রাণে সবে,
চাই না শুনিতে ক্রূরের ছল।"

সখে! জীর্ণ তনুতরী অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়াছি। আর অনুযোগে ফল কি? সমাজের মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে দেও। যদি আমি ধর্ম্মদ্রোহীই প্রমাণিত হইয়া থাকি, তবে এই পাপীকে রক্ষার্থ প্রয়াস পাওয়া কি অবোধের পরিচায়ক নহে? শীঘ্রই এ মূর্ত্তি নরলোক হইতে অদৃশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু একটী নিবেদন,—"আমি সাধারণের নিকট এক দিনের জন্ত অবসর প্রার্থনা করি—এক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। কল্য শিরাজ নগর হইতে এক প্রিয় বন্ধুর এখানে শুভাগমন হইবে। তিনি সমধিক বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভাসম্পন্ন অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং ধার্ম্মিক বলিয়া জগৎপ্রসিদ্ধ। গুপ্ততত্বে তাঁহার অধিকারও যথেষ্ট। তিনি জনসমাজে শেখ কবির বলিয়া পরিচিত। আমি তাঁহার সহিত ক্ষণকাল আত্মবৃত্তান্ত জানাইয়া কথোপকথন করিতে বাসনা করি। আমার এ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইলে তোমাদের অভিলষণীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে আর ক্ষণবিলম্বও সহ্য করিও না।"

বিজ্ঞবর আবুবকর শিব্‌লী ধর্ম্মোন্মত্ত ঋষিসত্তম মনস্থরের এই সদর্থযুক্ত সতেজ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরুত্তর হইলেন ও তদীয় জীবন রক্ষায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে মহর্ষির শেষ আবেদন সাধারণ্যে জ্ঞাপন করিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর সেই প্রস্তাবে সকলেই সম্মতি প্রদান করিল। কোন কোন গোঁড়ার দল শুভ কার্য্যে বিলম্ব ঘটিল অথবা ভবিষ্যতে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বলিয়া নাসিকা কুঞ্চনপূর্ব্বক ক্ষুণ্ণ রহিল।

মনস্থরের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এক দিনের জন্য স্থগিত হইল। আর এক দিনের জন্য তিনি ইহলোকে অবস্থিতি করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। ইহা শুনিয়া সমবেত নাগরিকগণের কেহ কেহ গৃহাভিমুখী হইল। কিন্তু অনেকেই উত্তেজনাধিক্য বশতঃ সেই স্বল্প সময়ের জন্য বাটীতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিল না; নগর বহির্ভাগে সুকোমল মখমল সদৃশ সেই শ্যাম দূর্ব্বাদল ক্ষেত্রেই আনন্দ-কোলাহলে যামিনী যাপন করিতে লাগিল।

কোন কার্য্যের অপেক্ষায় উৎসুক ও উদ্বিগ্নচিত্তে সময়াতি-বাহিত করার চেয়ে আর যন্ত্রণা নাই। তখন সময় যেন অতীব দীর্ঘ হইয়া পড়ে, এক মুহূর্ত্ত একটী যুগ বলিয়া অনুমিত হয়, কিছুতেই কাটিতে চায় না। প্রান্তরস্থিত নাগরিকগণ আজি

এই অবস্থায় অবস্থাপিত। তাহাদের সময় আর কাটিতেছে না। কখন্ প্রভাত হইবে, কখন্ সূর্য্য উঠিবে, কখন্ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কার্য্যে পরিণত হইবে, এই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কত মনোরঞ্জন উপকথা বলিয়া, কত রঙ্গরস, কত বৈষয়িক জল্পনা, কত ধর্ম্মালোচনা করিয়া দলে দলে ইতস্ততঃ পাদচারণ পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতেছে। দেখিতে দেখিতে ত্রিযামার যামত্রয় অনন্তের গর্ভে অলক্ষ্যে বিলীন হইয়া গেল। শ্বেতরশ্মি নিশাকর ক্লান্ত কলেবরে পশ্চিম আকাশের দিকে ঢলিয়া পড়িল। ক্রমে কনককান্তি নক্ষত্রকুল আপনাদের জীবনকালের স্বল্পতা উপলব্ধি করিয়া ত্রাসে নিষ্প্রভ ও ব্যথিত হইয়া টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নিশাবসানের পূর্ব্বদূতস্বরূপ মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গম সমূহ কলস্বনে দিগন্তের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। সেই কাকলী সুখস্পর্শ পবন-বাহনে আরোহণ করিয়া তর তর বেগে দূর দূরান্তে ভাসিয়া চলিতে লাগিল। সহসা উদয়াচল পরিত্যাগপূর্ব্বক তিমিরারি দিনমণি মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে নভস্তলে সমুপস্থিত,—রজনী প্রভাতা হইল। নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে,—তপনের তরল কিরণ-ছটায় নীলাকাশ মনোরম অনুরঞ্জিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনসুরের কথিত সেই সুধী পুরুষের আগমন-বার্ত্তা জনতার মধ্য হইতে বিঘোষিত হইল। তিনি

প্রান্তরে লোক-সমাগম দর্শনে ও তাহাদের বাক্‌বিতণ্ডা শ্রবণে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন; শেষে হতাশব্যাকুল মনে মনসুরের দিকে শশব্যস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অসহিষ্ণু জনস্রোতও তদীয় পশ্চাদনুসরণ করিল।

এই সর্ব্বজন-সুপরিচিত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি মনসুরের সম্মুখীন হইয়া প্রথমতঃ যথাবিহিত সাদর সম্বোধনে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন; অনন্তর কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর অনুতাপের সহিত ধীরগম্ভীরে কহিলেন, "সখে! ধর্ম্মাচরণে ও পাণ্ডিত্যে আপনি জগৎপ্রসিদ্ধ। পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান-বিশারদ ব্যক্তি আপনার তুল্য অতি বিরল। কিন্তু বলুন, কি জন্য সেই নিগূঢ় তত্ত্বের আবরণ উন্মোচন করিয়া— খনিস্থিত লুক্কায়িত মণির ন্যায় উজ্জ্বল সত্য প্রচারে উদ্যত হইয়া অবিজ্ঞ মূর্খের সদৃশ আপনাকে ভীষণ বিপদে পাতিত করিলেন? আজি আপনি শত্রুপরিবেষ্টিত, জগতের বিচারে অপরাধী। যাঁহারা আপনার আত্মীয়-স্বজন, যাঁহাদের নিকটে সর্ব্বথা সম্মানিত ও পূজিত ছিলেন, যাঁহাদিগকে আপনি পরম মিত্র জ্ঞান করিতেন, তাঁহারাই আজ ধর্ম্মের অনুরোধে— সমাজের প্ররোচনায়, আপনার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত। আপনি একেশ্বর, অসহায় ও দুর্ব্বল। প্রবলের নিকটে দুর্ব্বলের পরিণাম যে কিরূপ শোচনীয়, তাহা ত আপনি বিদিত আছেন?

আপনার মহান্ বাক্যের গভীর তাৎপর্য্য সর্ব্ব-জ্ঞান-গরীয়ান্ জ্যোতির্ম্ময় জগদীশ্বর এবং তদীয় অনুগৃহীত সাধক পুরুষ ব্যতীত জগৎ বুঝিতে অশক্ত। যাহা জগৎ বুঝে না, যাহা সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য, সত্য হইলেও তাহা অসত্য, অভ্রান্ত জানিলেও ভ্রান্ত বিশ্বাসে তাহার পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য, মনুষ্য-সমাজে সেই কঠিন জটিল সমস্যার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে নিরস্ত থাকাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত। যে তত্ত্ব গুপ্ত, তাহা চিরগুপ্তই থাকুক। দেখুন, লোকে স্বকীয় ধনসম্পত্তির নিরাপদ জন্য গুপ্তভাবেই রাখিয়া থাকে, এবং তজ্জন্য সদা শঙ্কিতচিত্তে বাস করে। কিন্তু আপনি কোন্ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এবং কি জন্য তাহা প্রকাশ করিয়া স্বেচ্ছায় দস্যুতস্করের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িলেন? আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল অতীত হইতে চলিল, আলাময় অনলরাশি অন্তরে ধারণ করিয়া অবিচলিতভাবে অবস্থান করিয়া আসিতেছেন; কখনও আপনার স্বাভাবিক ভাবের পরিবর্ত্তন বা ব্যত্যয় ঘটিতে দেখি নাই। কখনও আপনার সাধক-জনোচিত সহিষ্ণুতার লাঘব হইতে শুনি নাই। কিন্তু হায়, সংপ্রতি এ কি অজ্ঞানান্ধের ন্যায় কার্য্য করিয়া বসিয়াছেন? এই অসহিষ্ণুতায়—উন্মত্ততার কারণ কি? যাহা এত দিন অন্তরে রাখিয়াছিলেন, তাহা অন্তরেই পোষণ করিয়া

রাখা কি উচিত ছিল না? যাহা হউক, অধিক আর কিছু বলিবার নাই, স্থিরচিত্তে আমার কথা শ্রবণ করুন। যে উক্তি লোকের শ্রবণ-কঠোর বোধ হয়, সমাজ যাহাতে অধর্ম্ম বিবেচনা করেন, যাহার প্রশ্রয় দিতে বালবৃদ্ধ কেহই সম্মত নহেন, আপনি এবম্বিধ উক্তির উচ্চারণে ক্ষান্ত থাকিয়া আপনাকে বিপদমুক্ত করুন, ইহাই আমার অনুরোধ।”

মন্‌সুর আদ্যোপান্ত সমুদায় শ্রবণ করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “যদি মূর্খতাই না করিব, যদি ধৃষ্টতাই না হইবে, তবে আজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় সমুপস্থিত হইব কি জন্য? নর-বিচারে অপরাধ করিয়াছি বলিয়াই ত অপরাধী! নতুবা নিরপরাধের কেশস্পর্শ করে, কাহার সাধ্য? কিন্তু জানিবেন, ইহা বিধি-লিপি! বিধাতা-পুরুষ অদৃশ্য অক্ষরে ললাট-ফলকে যে সমস্ত ভাবী ঘটনার উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন, জীবনে তাহা ঘটিবেই ঘটিবে—কিছুতেই খণ্ডিত হইবার নহে। সুতরাং আমি স্বয়ং সাধ করিয়া যে আত্মনাশে উদ্যত হই নাই, ইহা স্থিরনিশ্চয়। ইহা বিধাতার কার্য্য! আপনি ত সমস্তই অবগত আছেন? এবং আমার বর্ত্তমান আন্তরিক ভাবনিচয়ও ত হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন? আমি অপার জ্যোতিঃসমুদ্রের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডবৎ অতি প্রবল তরঙ্গমালায় দোদুল্যমান; ইচ্ছা, স্থির

থাকিব, কিন্তু পারি কই? সে শক্তি আমার কোথায়? মুহূর্ত্ত মধ্যে চলোর্ম্মি প্রভাবে আমার অসংখ্য বার উর্দ্ধাধোভাবে উত্থান পতন হইতেছে। সুতরাং অনর্গল মুখদ্বার দিয়া অন্তরের কথা উচ্ছ্বলিত হইয়া স্বতই বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাহা রোধ করিতে আমার সামর্থ্য নাই,—প্রবৃত্তিও হয় না। অতএব যে কারণেই হউক, আমি প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত পাত্র। আহা কি আনন্দ! কি সুখদর্শন! আজ সমুদয়ই আলোকময় দেখিতেছি—আকাশ পাতালভরা একই আলোক, দ্বিতীয় আলোক নাই। কি আশ্চর্য্য! কি মনোরম! এমন ঔজ্জ্বল্য-লহরী-লীলা ত কখন দেখি নাই!! হে জ্ঞানময়! বিলম্বে প্রয়োজন কি? বোগ্দাদবাসিগণের এবং আমার মনস্কামনা শীঘ্র পূর্ণ হউক। হে হিতৈষি! যদি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা জিজ্ঞাসা করেন, তবে বিনা চিন্তায় সরাহুসারে আপনিও ইহার ব্যবস্থা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।"

সুবুদ্ধি শেখ কবির, মহর্ষি মনসুরের এতদ্বাক্য শ্রবণে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি বিষম মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, তাই অবশেষে মৃদুস্বরে কহিলেন, "আপনার কথা সমস্তই সত্য। উহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, কার্য্যটী

কি মর্ম্মভেদী! কি লোমহর্ষণ! এমত সঙ্কটস্থলে আমাকে ব্যবস্থা লেখা কি সম্ভব হইতে পারে?” মনসুর উচ্চ স্বরে কহিলেন, “পারে—অবশ্যই পারে? “সরার” বিধানকে প্রতারণা করা আমার বাসনা নহে—আপনারও হইতে পারে না। শাস্ত্রমতে যখন আমি শূলাস্ত্রে বধার্হ প্রশস্ত, তখন তাহাতে নীরবতা অবলম্বন করিয়া স্বীয় দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করা অকর্ত্তব্য। অতএব আমার অনুরোধ, আপনি ব্যবস্থা দিতে ইতস্ততঃ করিবেন না।” এইরূপ বহুবিধ কথোপকথন হইল। সেই কথোপকথনের ঘাত প্রতিঘাতে উভয়ের মুখ হইতে কত নৈতিক উপদেশ, কত গূঢ় তত্ত্ব-কথা, কত প্রিয় প্রসঙ্গ বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু অল্পবুদ্ধি জনমণ্ডলীর তাহা বুঝিবার হৃদয় কোথায়? ফলতঃ যে বুঝিল, সে মৃতবৎ দণ্ডায়মান হইয়া অবিরল অশ্রুধারে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। ব্যথিত-প্রাণ মহাত্মা কবির আর অপেক্ষা করিলেন না; জনতা ভেদ করিয়া মনসুরের নিকট হইতে বহির্ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

মহর্ষির বাক্যালাপ সাঙ্গ হইলে, চতুর্দ্দিকস্থ মানবমণ্ডলী কোলাহল করিয়া উঠিল। অনেকে মনসুরের কথিত মতে ব্যবস্থাপ্রার্থী হইয়া আগন্তুক শেখ সাহেবকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেই মহামনস্বী ব্যক্তি কিয়ৎকাল নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিলেন। তাঁহার অন্তর মধ্যে নানা চিন্তার আবির্ভাব হইল। অনন্তর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হে বোগ্‌দাদের ইস্‌লাম-সন্তানগণ! দৃঢ়ব্রত মনসুরের সহিত যে সমস্ত কথা হইল, তাহা আপনারা সকলে শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার গুপ্তাবস্থা অর্থাৎ মানসিক ভাব সেই সর্ব্বজ্ঞ বিশ্ববিধাতাই অবগত আছেন। তাহাতে ইনি অপরাধী কি না, তাহা তিনিই জানেন। তবে প্রকাশ্য অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিলে তিনি যে অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুপবিত্র "সরার" বিচারে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। কিন্তু তজ্জন্য ব্যাকুল কেন? যিনি ঈশ্বরের পথে স্বয়ং আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাঁহার প্রতিকূলে ব্যবস্থার আবার প্রয়োজন কি বল দেখি? বিচার-

পতি কাজীই বা তাঁহার কি বিচার করিবেন? তিনি ত আপনার বিচার আপনিই করিয়া রাখিয়াছেন! আপনারা যাহা চাহিতেছেন,—তিনিও তাহাই চাহিতেছেন, এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু ইত্যবসরে অনেকগুলি নিষ্ঠুর ও উদ্ধত প্রকৃতির লোক বিলম্বজনিত বিরক্তির সহিত মহর্ষিকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া আনিয়া বধ্যস্থানে উপস্থিত করিল। আহা সেই শুদ্ধকর্ম্মা পুরুষের পবিত্র ও কোমল অঙ্গে কত ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত নির্দ্দয় রাক্ষসের কঠোর কুলিশোপম হস্ত পতিত হইল। আবার মহাকোলাহল—আবার মহাধুমধাম পড়িয়া গেল। সকলেরই দৃষ্টি সেই একই কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইল। অন্তরে, অদূরে, সর্ব্বত্রই একটী অভিনব দৃশ্যের সৃষ্টি হইল। অহো! সে দিনের সেই ভীষণ দৃশ্যের—সেই ভয়াবহ ঘটনার বর্ণনা করিয়া উঠে, কাহার সাধ্য? প্রান্তরের চতুর্দ্দিকেই যেন প্রলয়-তুফান বহিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকেই সংখ্যাতীত লোকের সমাবেশ। পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় বধ্যভূমি লক্ষ্যে সুবিশাল বোগ্‌দাদ নগরবাসীদের দ্রুত গমনের বিরাম নাই; জনকোলাহলে আকাশমার্গ গম্‌গম্ করিতে লাগিল। কাহার মুখে শোকসূচক হাহাকার ধ্বনি, কেহ বা আনন্দ প্রকাশে নিরত হইল।

"আজ প্রণয়-পরীক্ষার দিন! প্রেমিক স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া প্রণয়পাত্রের সম্মুখীন হইতেছেন,—বিচ্ছেদের বিষাদময়ী রজনীর অবসানে সুখময় মিলন-প্রভাত সমুপস্থিত হইতেছে। প্রেমিক ও প্রণয়াস্পদ নিয়ত নির্ভয়ে প্রণয়ার্ণবে নিমগ্ন থাকিবেন, আজ তাহার সূচনা হইতেছে। বিরহের বিষম চিন্তা আজ চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। বহু দিন হইতে যে হৃদয় শূন্য ছিল, আজ তাহা পূর্ণ হইতে চলিল। দগ্ধ ক্ষতে শান্তিসুধার বর্ষণ হইতেছে। আজ ঈশ্বরের কৃপায় সাধকের চিরাভিলাষ সিদ্ধ হইতেছে।" এবম্প্রকার বহু বাক্যে যাবতীয় লোক, কেহ সুভাবে, কেহ বা রহস্য ও অসূয়াপরবশ হইয়া পরিহাস-প্রকাশক কণ্ঠে যাহার মুখে যাহা আসিল, সে তাহাই কহিল। কিন্তু দৃশ্যটী কি লোমহর্ষণ! ঘটনাটী কি নৃশংস!! কার্য্যটী কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী বেদনাব্যঞ্জক!!! সে দিকে কাহার দৃষ্টি নাই; কার্য্যের গভীরতা পরিমাণ করিতে ও পরিণাম চিন্তা করিতে সকলেই অক্ষম। হা বিধাতঃ! হে প্রেমময় পরাৎপর প্রভু! প্রেমের কি পরিণাম এই? প্রেমিকের পুরস্কার কি এইরূপেই হইয়া থাকে? হে বিশ্বপ্রেমিক! তোমার সহিত প্রণয়-বন্ধনে প্রণয়ী আবহমান কাল সুখ-শান্তিতে থাকিয়া লোকের ভক্তি, প্রীতি ও সম্মান লাভ করিয়াই আসিয়াছে, কিন্তু কাহাকে কবে অরাতিকরে জীবন বিসর্জ্জন

করিতে হইয়াছে ; আজের এ ঘটনা নিখিল ধরণীধামে অভিনব, অলৌকিক, অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব। * ধন্য মহর্ষি মনসুর ! ধন্য তুমি অকৃত্রিম প্রেমিক ! ধন্য তুমি সাধনসহিষ্ণু ধর্ম্মবীর ! ধন্য তোমার তত্ত্বজ্ঞানজনিত বৈরাগ্য ! আজ তোমার বিচ্ছেদানল—হৃদয়ের সন্তাপানল নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, পীড়ার উপশম হইতে আর বিলম্ব নাই। ত্বরায় প্রিয় সহ প্রিয় সম্ভাষণে সম্মিলিত হইবে। হীনবুদ্ধি লোকেরা ভাবিতেছে, তুমি ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে এখানে আনীত হইয়াছ। কিন্তু তোমার মনে ত সে ভাবের লেশমাত্র নাই ! তুমি ভাবিতেছ, তোমার সুখের পথ নিষ্কণ্টক হইতেছে ; দুঃখময়ী অমানিশার অবসান হইতেছে। কখন সর্ব্ব-ভুবন-প্রকাশক দিনমণির শুভ্রালোকে চরাচর উদ্ভাসিত হইবে, তুমি সেই আশায় শুষ্ককণ্ঠ চাতকের ন্যায় সময় গণনা করিতেছ। বদনে চিন্তার ছায়াপাত মাত্র হয় নাই ; চিত্ত বিকাররহিত—প্রফুল্ল। মরি মরি কি মধুর। কি অলৌকিক ! কি অভাবনীয় অমায়িক ভাব !! মহর্ষে ! এ জগতে তুমিই তোমার একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল।

(*) খৃষ্টীয়ানদিগের মতে মহাত্মা যীশুখৃষ্টের (হজরত ইসা নবীর) শূলে আরোপিত হইবার ঘটনাও এরূপ অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের জলন্ত উদাহরণ বা এরূপ অকৃত্রিম প্রেম-প্রকাশক নহে।

লোকারণ্যের মধ্যস্থলে উচ্চশির শালবৃক্ষ-সদৃশ মস্তক উন্নত করিয়া—অগণিত অজ মধ্যে মহাবল শার্দ্দূল সম সাহসে স্ফীত হইয়া মহামনস্বী মন্সুর অনন্যমনে দণ্ডায়মান,—অন্তরে উদ্বেগের চিহ্ন নাই, মুখে বচন নাই—নির্ভয়, নিস্পন্দ ও নীরব। ভয় করিবেন কাহার? সাগর কি শিশিরের ভয় করে? মাতঙ্গের মনে কখন কি পতঙ্গের শঙ্কা জন্মে? আহা মহর্ষির সে সময়ের ভাব অতি মধুর, অতি গম্ভীর ও প্রফুল্লতা-ব্যঞ্জক। সংখ্যাতীত নরচক্ষু তাঁহার প্রতি তীব্র লক্ষ্যে অপলকে চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সহসা কি এ অত্যদ্ভুত ঘটনা! ইহা ঐন্দ্রজালিকের মোহকরী যাদুবিদ্যা হইতেও বিস্ময়জনক ও চমকপ্রদ। অকস্মাৎ জলদ-নির্ঘোষে "আনাল্ হক্" শব্দ সাধারণের শ্রুতি-বিবরে প্রবিষ্ট হইল। পরমুহূর্ত্তে দেখে, মন্সুর নাই। এই ছিল, এই নাই। প্রাণান্তক যমদূত সমকক্ষ প্রহরীগণ-পরিবেষ্টিত বন্দী তপস্বী, শত শত নর-নেত্র-পথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিল না। সকলেই যথাস্থানে একই অবস্থায় দণ্ডায়মান, পিপীলিকা প্রবেশের পথ নাই, বাতাস নিঃসারিত হয়, এমন ছিদ্র নাই; তবে মন্সুর কোন্ শক্তি প্রভাবে কেমন করিয়া কোন্ পথে পলায়ন করিলেন? বিদ্যুৎস্ফুরণ কার্য্য সম্পাদিত হইতে

যতটুকু সময় লাগে, তদপেক্ষাও স্বল্প সময়ের মধ্যে, মুখের কথা মুখে বিলীন হইতে না হইতে, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে এই ঘোর পরিবর্ত্তন! ইহা কি ভৌতিক ঘটনা! কে বলিতে পারে, ইহা ভৌতিক ঘটনা! ফলতঃ সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রসনা নীরস, মুখ মলিন, হৃদয় উৎসাহহীন, শরীরে বল নাই। জনসাধারণ যেন গতিশক্তি-বিরহিত প্রস্তর-খোদিত প্রতিমাবৎ অবশ ও অচল। কে যেন অকস্মাৎ নয়নে ধাঁদা লাগাইয়া দিল; আনুপূর্ব্বিক তাবত ঘটনা স্বপ্নময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অনন্তর কিছুক্ষণ পরে, আবার ভয়ানক কোলাহল সমুত্থিত হইল। সকলেই নানাপ্রকার বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইল। মন্‌সুরের ক্ষমতা অদ্ভুত, এ ক্ষমতা সাধনা-সম্ভূত, বিস্ময়ের একশেষ এ দৃশ্য ইত্যাদি বলিয়া অনেকে তাঁহার প্রশংসা-গান করিল। নিরীহ ধর্ম্মসেবকগণ "হা ঈশ্বর! তুমিই মহান্" বলিয়া প্রসন্নমনে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিলেন। কিন্তু মন্‌সুরবিদ্বেষীদলের মুখ রোষে, ক্ষোভে, লজ্জায় ও অপমানে অবনত। "ধৃত ব্যাঘ্র পলায়ন করিয়াছে, হায় ধর্ম্মাবমাননার বুঝি আর প্রতীকার হয় না।" চঞ্চলমতি গোঁড়ার দল ইহাই ভাবিয়া আকুল। অনন্তর কি কৌশল করিলে মন্‌সুরের পুনরাবির্ভাব

হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। কিন্তু কেহই ভাবিয়া কোন সূক্ষ্ম উপায় বাহির করিতে পারিল না। তখন প্রধান পক্ষীয়েরা পরামর্শ করিলেন, "মনসুরের প্রতি কটূক্তি ও তৎপক্ষাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করিলে, নিশ্চয় তাঁহার পুনর্দ্দর্শন পাওয়া যাইতে পারিবে। তিনি এই স্থানেই আছেন, কিন্তু আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ নয়ন তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না; ফলতঃ এ কার্য্য করিলে তিনি কিছুতেই আর অন্তরালে থাকিতে পারিবেন না।" এই সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া, তাঁহারা সমবেত জনমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিলেন। তাহাতে দুর্দ্দান্তস্বভাব অর্ব্বাচীনেরা আঘাত-প্রাপ্ত বিষধরের ন্যায় ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ঋষিরাজকে অকথ্য কটূক্তি করিতে লাগিল ও তৎপক্ষসমর্থনকারী সহমতাবলম্বী সাধুদিগকে বিকৃত স্বরে পরিহাস ও কুবাক্যবাণ বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতেও সফলকাম না হওয়ায়, পরস্পর ইঙ্গিতানুসারে সজোরে প্রস্তরাঘাতপূর্ব্বক সেই নিরীহ ব্যক্তিগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত। বিড়ম্বনার একশেষ। অবিচার-উৎপীড়ন পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। মারধরসূচক হুহুঙ্কার নাদে যেন প্রবল বাত্যার সৃষ্টি হইল। এদিকে অদৃশ্য যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া এই বীভৎস কাণ্ড দর্শনে তপোসিদ্ধ মনসুর আর সহ্য করিতে পারিলেন না।

একের পরিবর্ত্তে অপরের নিগ্রহ, অপমান—দণ্ডভোগ! ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রেমপূর্ণ "আনাল্ হক্" শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া,—অত্যাচারীগণের অন্তর কাঁপাইয়া আবার সকলের দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসিলেন। অমনি নির্লজ্জ ক্রূরকর্ম্মাগণ সক্রোধে তাঁহার উপরে প্রস্তর বর্ষণে রত হইল। ইহা দেখিয়া তিনি ত্বরিতপদে শূলাস্ত্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে বর্ষার বারিপাতের ন্যায় মহর্ষির উপর আরও অজস্র প্রস্তর পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সাংঘাতিক আঘাতেও কোন দিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই; সাধনসহিষ্ণুতার ফলে মনের ভাব পূর্ব্ববৎ তুষ্টিজনক ও বিকাররহিত। বিষাদের কালিমা রেখার পরিবর্ত্তে হাস্যের আনন্দলহরী তাঁহার বদনমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান। কেননা শত্রুনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত কঠিন পাষাণ তাঁহার শরীরে প্রস্ফুটিত ফুলের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া পড়িয়াছিল, এবং তজ্জনিত আঘাত তিনি সুকোমল কুসুম-স্পর্শ তুল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। পরন্ত আর একটী বিস্ময়জনক ঘটনা—এই সময়ে শেখ শিব্‌লীর নিক্ষিপ্ত একটী পুষ্পাঘাতে তিনি মর্ম্মান্তিক কাতর হইলেন। প্রস্তরাঘাতে আনন্দ এবং পুষ্পাঘাতে যাতনা! প্রকৃতই ইহা বিস্ময়ের কথা বটে! ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে মহর্ষি সহর্ষে বলিলেন, "ধর্ম্ম-মর্ম্ম-জ্ঞানহীন অপ্রেমিক অত্যাচারীর

প্রহার হইতে আমি স্বাধীন। অন্ধের লক্ষ্য কখন কি ঠিক হইতে পারে? ফলতঃ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সন্ধান অব্যর্থ ও মারাত্মক। আমার বন্ধুর প্রেমিক যিনি, যাঁহার সহিত আমার নিকট সম্বন্ধ, যিনি আমার ব্যথার ব্যথী, তাঁহার তৃণাঘাতেও কষ্টানুভব হইয়া থাকে।" পুনঃ প্রশ্ন হইল, শিব্‌লী বলিলেন, "হে প্রিয়ম্বদ প্রিয়বর! 'প্রেম' শব্দটী সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই, কিন্তু সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া বলুন, প্রেমের অর্থ কি?" মহর্ষি কহিলেন, "হে শিব্‌লি! প্রেমের ব্যাখ্যা কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই? ইহার প্রকৃত অর্থ, "হত্যা ও সর্ব্বসমক্ষে প্রেমিকের শব দগ্ধ করণ। শীঘ্রই এ ঘটনা দেখিতে ও বুঝিতে পারিবেন।" "আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অর্থ কি?" কহিলেন, "অতি সামান্য, অতি সূক্ষ্ম, রেণু-কণা সদৃশ। যাহা দেখিয়াছেন, সে সমস্ত অনর্থক চিন্তামাত্র।" এইরূপ ধীরচিত্তে মহর্ষি বহুলোকের বহু প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলেন। অবশেষে তেজস্বী ধর্ম্মবীর প্রসন্ন-বদনে শূলীদণ্ড চুম্বনপূর্ব্বক স্বয়ং বধমঞ্চে আরোহণ করিলেন। তখনও প্রস্তর পতনের বিরাম নাই, তখনও লোকের ক্রোধের উপশম নাই! কিন্তু সাধারণে তাঁহার অবিচলিত ধৈর্য্যশীলতা ও দৃঢ়হৃদয়তা দেখিয়া আরও চমৎকৃত হইল।

তদনন্তর মহাতপা মন্‌সুর জগৎপাতার উদ্দেশে উর্দ্ধমুখে

হস্তোত্তোলন করিয়া, প্রার্থনা পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে "হক্ হক্ আনাল্ হক্" শব্দোচ্চারণে দিক দশ বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। কি আশ্চর্য্য! কি অলৌকিক ঘটনা! বিধাতার কি অননুভূত বিচিত্র লীলা!! যে শব্দের উচ্চারণে বোগ্‌দাদের জন-সাধারণ মন্‌স্থরের প্রাণহন্তারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এক্ষণে সেই নিষিদ্ধ "আনাল্ হক্" বাক্য তাহাদেরই রসনা হইতে স্বতঃ অনিবার্য্য-রূপে ভূয়ো-ভূয়ঃ নিঃসারিত হইতে লাগিল। কে যেন তাহাদের রসনা-যন্ত্র ঘূর্ণিত করিয়া এই ধ্বনি বাহির করিতে লাগিলেন। কেহই নিস্তব্ধ নহে; সকলে এই একই ধূয়ায় উন্মত্ত। কেবল মনুষ্য নহে, নির্জ্জীব জড়পদার্থ ও উদ্ভিজ্জাদিও ঐ ধ্বনি বহির্গমনে ক্ষান্ত রহিল না। মানবমণ্ডলীর মুখে "আনাল্ হক্," পদদলিত দুর্ব্বাদলে "আনাল্ হক্," ইষ্টকপ্রস্তর-মৃৎখণ্ডে "আনাল্ হক্," তরু-লতা-গুল্মে "আনাল্ হক্," অলক্ষ্য বায়ু-সাগরে "আনাল্ হক্," উড্ডীয়মান মেঘমালায় "আনাল্ হক্," পশু-পক্ষী-কীট-মুখে "আনাল্ হক্"; এইরূপ যে দিকেই কর্ণ-পাত করা যায়, সেই দিকস্থ স্থাবরজঙ্গম যাবতীয় পদার্থেই উক্ত একবিধ শব্দবিনির্গমন শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আহা, এতদপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়—অমানুষিক ঘটনা আর কি হইতে পারে? আরও আশ্চর্য্য, যাহারা বিরুদ্ধপক্ষ, তাহাদিগকেও আজ অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে আসিয়া জড়-অজড় পদার্থ

নিচয়ের সহিত সেই একবিধ দোষেই দোষী প্রমাণিত হইতে হইল। ইহা দৈবের কৌশল, না বিড়ম্বনা ?

বিপক্ষদল এই দৈবনির্ব্বন্ধে বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত ও নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইল এবং উপায়ান্তরবিহীন হইয়া অধৈর্য্যের সহিত উচ্চৈঃস্বরে ঘাতককে কহিল, "আর বৃথা বিলম্বের প্রয়োজন কি ? আর বিড়ম্বনা-ভোগ কি জন্য ? উহার প্রাণবায়ু যত শীঘ্র দেহবাস শূন্য করিয়া অনন্ত বায়ু-সাগরে বিলীন হয়, ততই মঙ্গল। তুমি তাহারই আয়োজন কর। ইহার সর্ব্বাবয়ব সুতীক্ষ্ণ অসি প্রহারে শতধা বিচ্ছিন্ন করিতে—অস্থি-সন্ধি পৃথক্ করিতে আর ক্ষণমাত্র দয়ার অপেক্ষা করিও না।" উঃ কি লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর কথা ! কি বজ্রলেপহৃদয় নির্ম্মমগণের নিষ্ঠুরাদেশ ! কি অমানুষিক পৈশাচিক অত্যাচার ! শুনিলে অন্তরাত্মা উড়িয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে, শোণিত বিশুষ্ক হয়, নিতান্ত পাষাণহৃদয়ও দয়ার্দ্র হইয়া থাকে। আহা তৎকালে তথায় কি কেহই ছিল না,—মহর্ষির গূঢ় উক্তির মর্ম্মগ্রহ করিতে যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ,—নৃশংস হত্যার কবল হইতে ধার্ম্মিককে রক্ষা করিতে প্রকৃত নরশার্দ্দূল কেহই কি বিদ্যমান ছিল না ? বড়ই ক্ষোভের কথা ! বড়ই পরিতাপের বিষয় ! লেখনি ! ভস্মীভূত হও, মস্যাধারে মসী বিশুষ্ক হউক। হস্ত ! আজ অচল হও, এই দুর্ব্বিষহ শোকের কাহিনী বর্ণনা

করিতে আর অগ্রসর হইও না। বিধাতঃ! এই কি তোমার ভক্তগত প্রাণ! এই কি তোমার অনুগতের কুশল সাধন? এই কি তোমার বন্ধুত্বের প্রতিদান? ক্ষুদ্র নর আমি, বুঝিতে পারিলাম না। প্রভো! তোমার এ কেমন কৌতুকাবহ লীলাখেলা প্রিয় পাঠক! আসুন, একবার মনশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করুন, কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য। ঐ দেখুন, অজ্ঞানান্ধদের আজ্ঞাক্রমে কালান্তক যমদূত স্বরূপ নির্দ্দয় ঘাতকের বিজলীবিনিন্দিত চাকচিক্যশালী খরশাণ তরবারি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। মহর্ষি তন্নিম্নে মস্তক অবনত করতঃ ঘাতককে বিনীতভাবে কহিলেন, "ভাই! শীঘ্র স্বীয় কার্য্য সম্পাদন কর। আমার অন্তর অহারজনী দগ্ধ হইতেছে। যদি দেখাইবার হইত, তবে আজ জগৎকে দেখাইতাম, দেখিয়া বুঝিত। আমার হৃদয়ে সুখ নাই,—মনে শান্তি নাই, অন্তর অনলপূর্ণ—তুফানময়! তুমি আজ সেই আগুন নিবাইয়া দিয়া বন্ধুর কার্য্য কর।"

মহর্ষির বিনীত বচন শ্রবণমাত্র নিষ্ঠুর ঘাতক অসিপ্রহারে তাঁহার সুপবিত্র দেহ হইতে হস্তদ্বয় বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। অমনি দুই বাহুমূল হইতে পবিত্র শোণিত-প্রস্রবণ দ্রুত উচ্ছ্বসিত হইয়া সুদূর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তরঞ্জিত,—রক্তপ্রবাহে ধরাতল কর্দ্দমাক্ত হইল। অহহ কি

ভীষণ নিষ্ঠুর কাণ্ড! অকস্মাৎ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে বিলাপসূচক করুণ কাতরোক্তি অলক্ষ্যে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। প্রকৃতির হাস্যভরা বদনমণ্ডলে যেন বিষাদের বিষম কালিমা-কুজ্ঝটিকার সঞ্চার হইল। বিশ্বসংসার অন্ধকারময়! অহো, তৎকালে এই অবিচার-অত্যাচারের লীলাস্থলী বসুমতী ঘন ঘন বিকম্পিত হওতঃ রসাতল-তল-সাগরে বিপর্য্যস্ত না হইয়া, সেই পাপস্মৃতি এখন পর্য্যন্ত হৃদয়ে ধরিয়া আছে কেন, কেমনে বলিব? বিধাতার চক্র, বিধাতাই জানেন!

সহৃদয় পাঠক! বিদুষী পাঠিকাগণ! করুণাময় জগদীশ্বরের অনুগ্রহে কথায় কথায় আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে এত দূর পর্য্যন্ত আসিলাম। কিন্তু আর না—এক্ষণে মহাবিপদ—ঘোর সঙ্কট! কি সঙ্কট? তাহাও কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? যাহার আংশিক অবতারণায় আপনারা শোকে ক্ষোভে ম্রিয়মাণ ও মর্ম্মবেদনায় সংজ্ঞাশূন্য, অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছেন না, সে বিপদের কথা কি এখনও বলিয়া দিতে হইবে? এমন মর্ম্মভেদী ভয়াবহ ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই, কাহার নিকটে শুনেও নাই, জগতে আর কখন ঘটিয়াছে কি না, তাহাতেও ঘোর সন্দেহ আছে। হায় কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ভাবিয়া মস্তক ঘুরিয়া যাইতেছে,

কল্পনার উদ্ভাবনীশক্তি তিরোহিত হইয়াছে, হস্ত শিথিল ও রসনা অবশ। করধৃত লেখনীও কম্পিত। সুতরাং কি বর্ণনা করিব? বর্ণনা করিবার শক্তি কোথায়? তাই বলিতেছি পাঠক! আজ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি। জানিয়া শুনিয়া—ইচ্ছা করিয়া এমন কঠিন কার্য্যে কি প্রবৃত্ত হইতে আছে? কিন্তু কি করিব, হাত নাই, যে ঔষধ গুলিয়াছি, তাহা গিলিতেই হইবে।

মহর্ষির সুপবিত্র বাহুদ্বয় ভূপতিত হইয়া রুধিরাক্ত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই সহগুণের অবতার সাধকপ্রবর ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন—"মনুষ্যের স্থূল দৃষ্টির দৃশ্য আমার স্থূল হস্ত কর্ত্তিত হইল বটে, কিন্তু যে হস্ত নর-দৃষ্টির বহির্ভূত, আমার সেই অদৃশ্য সূক্ষ্ম হস্ত কাটিবার এ জগতে কাহারও ক্ষমতা নাই।" এই উক্তির পরে শোণিতার্দ্র বাহুমূলে স্বকীয় মুখমণ্ডল ঘর্ষণ করিলেন; তখন মুখশ্রী রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইল। শেখ শিব্লী ভগ্নহৃদয়ে কাতরকণ্ঠে তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি কহিলেন, "পবিত্রাত্মন্! আমি সেই পরাৎপর পরম বন্ধুর প্রিয় কার্য্য "নামাজ" পড়িবার উদ্দেশে "অজু" করিতেছি, পার্থিব জীবনের শেষ সাধ মিটাইয়া লইতেছি।

ভ্রাতঃ! আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি না, জানিবেন,—প্রেমের জন্য প্রেমিক আপনার জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে,—যথার্থ বন্ধুত্বপ্রয়াসী যিনি, তিনি বন্ধুর প্রীতি-সম্পাদনার্থ সকলই করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে জলের পরিবর্ত্তে স্বীয় শরীর নিঃসৃত রক্তে "অজু" করাই প্রশস্ত ও গৌরবের বিষয়। যে ব্যক্তি হৃদয়ের রক্ত দ্বারা "অজু" না করে, তাহার "নামাজ" সিদ্ধ নহে এবং সে প্রেমাস্পদের নিকট সম্মানিত হয় না। তাহার চিরাকাঙ্ক্ষিত সুখ পরম-পদ লাভে বঞ্চিত হওয়াও অসম্ভব নহে।" মহর্ষির এই বাক্য অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদযুগল কর্ত্তিত হইল। অমনি তিনি মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "বোগ্‌দাদবাসিগণ! হে ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তিবৃন্দ! নশ্বর পার্থিব পদ কর্ত্তন করা কঠিন কার্য্য নহে, কিন্তু যে পদ আনন্দময়ের অবিনশ্বর সুখ-রাজ্য দর্শনার্থ ধাবমান, এ জগতে কে তাহা কাটিতে ক্ষম-বান্ আছে?" এইরূপে নানা সৎপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ছিন্ন হইল। অবশেষে নয়নযুগল উৎপাটিত। উঃ কি বীভৎস ঘটনা! এই নৃশংস ব্যাপারে অনেক লোক অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। চারিদিকে হাহুতাশ পড়িয়া গেল। হায় হায় উচ্চ রোলে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু করুণা

কোথায়? দয়া কোথায়? মমতা কোথায়? এ ভীষণ অভিনয়ক্ষেত্র হইতে যেন তাহারা চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। পাঠক! ঐ দেখ দেখ, অশ্রু বর্ষণ কর, আর দেখ, ঘাতক মহর্ষির পবিত্র জিহ্বা ছেদন করিতে অগ্রসর! যে জিহ্বায় দিবা রজনী পবিত্র বাণী বহির্গত হইত, যে জিহ্বা উপদেশামৃত বর্ষণ করিত, ঘাতক তাহা কাটিতে উদ্যত হইল। তখন মহর্ষি প্রিয় ভাষে কহিলেন, "ভ্রাতঃ ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা কর, দুটী কথা বলিয়া লই। দুইটী কথা বলিবার অবসর আমাকে দেও।" ঘাতক অসি সংবরণ করিল। তখন রক্তাপ্লুত মাংসপিণ্ডস্থিত মস্তক ঊর্দ্ধমুখে কহিলেন,—"দয়াময়! এই দুরাচরণের জন্য ইহাদের উপর কুপিত হইও না—পরমপদলাভে বঞ্চিত করিও না। কেননা ইহারা যাহা করিতেছে, তাহা তোমারই জন্য করিতেছে।" এই সময়ে জনতার মধ্য হইতে এক লজ্জাহীনা বৃদ্ধা উপস্থিত হইয়া বলিল, "এই সে মন্‌সুর, এই সে ইস্‌লাম-বিরোধী! মার মার, খুব মার" ইহা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং ঋষিরাজের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। মহাত্মা মন্‌সুর তৎশ্রবণে জন্মের মত পবিত্র কোরাণোক্ত আয়েত (শ্লোক) বিশেষ উচ্চারণের পর আর একবার "আনাল্ হক্" ধ্বনি করিলেন। অহো সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি দিগ্‌দিগন্তরে বিকীর্ণ হইতে

না হইতে পবিত্র মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাশায়ী হইল। সাধক-শিরোমণি ধর্ম্মবীর হোসেন মন্সুর, অবিচলিতচিত্তে হাসিতে হাসিতে সাধুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, ঈশ্বর-প্রেমিকতার অতুলনীয় খ্যাতি রাখিয়া, সর্ব্বসমক্ষে জগদীশ্বরের নামে সুদুর্লভ ঋষিজীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার পূতাত্মা নশ্বর দেহ-বন্ধন বিমুক্ত হইয়া স্বর্গীয় সমীরণ সহযোগে অলক্ষ্যে উত্থান করতঃ সেই নিত্যধামে যোগ্য পাত্রে যাইয়া সম্মিলিত হইল, যে ধামে শান্তিসুখ, প্রেম-পবিত্রতা, আনন্দোৎসব চির-বিরাজমান, যে রাজ্যের প্রজা সকলেই সাম্য ভাবাপন্ন, —পরম সুখী, যেথানে প্রেমিকের প্রেমাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা লাভ করে—পিপাসা চিরনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। আর তাঁহার দেহ? অনিত্য—অসার—একত্রসংযোজিত পরমাণু-সমষ্টি দেহ? অনাদরে—অবহেলায়—বিকৃত অবস্থায় নানা নির্য্যাতন ভোগ করণার্থ ধূলায় ধূসরিত। কেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন? তাহার আদরে বা অনাদরে লাভালাভ কি আছে? কঞ্চুক পরিত্যাগ করিলে অহিবর সে দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না! কিসের আবশ্যক? কিন্তু পাঠক! এ সাধারণ কঞ্চুক নহে! পবিত্র আধেয় ধারণ করিয়াছিল বলিয়া এক্ষণে সেই কঞ্চুক—সেই সুপবিত্র আধার স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশে উদ্দৃপ্ত হইল।

তপস্বীর ছিন্ন শির ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইতস্ততঃ ধূলায় পতিত। নগরবাসীদের আর উদ্বেগ নাই—সমস্ত ক্ষোভ দুর হইয়াছে। কিন্তু আবার কি এ অলৌকিক ঘটনা!! সেই সমস্ত দেহাংশ ও প্রত্যেক রক্তকণিকা হইতে অবিরল "আনাল্ হক্" শব্দ নির্গত হইতে লাগিল—বিরাম নাই। মুহুর্মুহু—দমেঁ দমে "আনাল্ হক্" ধ্বনি বাহির হইতেছে। এই ঘটনায় অনেক লোক শোকসন্তপ্ত হইল, আবার উদ্বেগ উপস্থিত! বিপক্ষ দল ক্ষোভে ও অভিমানে ম্রিয়মাণ। কি করিবে? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে ক্রোধান্ধ হইয়া মৃত দেহ ও ছিন্ন মস্তক সহস্রধা ক্ষুদ্র অংশে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহাতে আরও বিপরীত কাণ্ড ঘটিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, তদ্রূপ করিলে সমস্ত জঞ্জাল কাটিয়া যাইবে—রোগের উপশম হইবে। ফলতঃ উপশমিত হওয়া দূরে থাক্, উত্তরোত্তর উপসর্গের বৃদ্ধিই হইতে চলিল। ঐশ্বরিক শক্তিপ্রভাবে সেই মাংস খণ্ড সমূহ হইতে সমস্বরে "আনাল্ হক্" শব্দোত্থিত হইয়া দশদিক প্রতিধ্বনিত করিল; সহসা যেন প্রবল ঝটিকায় শান্ত সাগর তরঙ্গায়িত হইল। পরিণাম আরও যে কি ভয়ানক হইবে, তাহাই ভাবিয়া সকলে চমকিত, অবাক্ ও ভয়বিহ্বল। প্রধান পক্ষীয়দের মুখ ম্লান,—আতালু বিশুষ্ক হইয়া গেল। পরন্তু ঘটনার

অলৌকিকত্ব ও অদ্ভুতত্ব এত দূর্ব্বাচীন নিরক্ষর মূর্খ; দিব্য-চৈতন্যোদয় হইতেছে না এবং কেহ ক্লব, ও চলচ্ছক্তিবিরহিত চরণ করিতে ক্ষান্ত হইতেছে না। ঐ রূপবতী কামিনী ও ও ভ্রমান্ধতা আর কি হইতে পারে? আহা সেই উন্মত্ত জন-মণ্ডলীর হৃদয় কোন্ উপকরণে গঠিত? তাহাতে কি কোম-লত্বের কণামাত্রও ছিল না? অহো! কি আক্ষেপ, দয়া-স্নেহ-করুণা-মমতার ছায়াও কি তাহাতে কখন পতিত হয় নাই? 'ধর্ম্মের আদেশ পালন করিতে গিয়া অবশেষে যাহা অধর্ম্ম,—নিতান্ত নিষিদ্ধ পাপকর্ম্ম, তাহাও সম্পাদিত হইতে চলিল। শরিয়তের (ইস্‌লাম-ধর্ম্মানুষ্ঠানের) দৃঢ়-বিশ্বাসী পণ্ডিত-গণের মতানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বীদল এক স্থানে পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপাকার কাষ্ঠাদি সজ্জিত করতঃ তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে লক্ লক্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া—ধূ ধূ শব্দে ভয়াবহ বিভাবসু জ্বলিয়া উঠিল। তখন সেই সমুদয় মাংস খণ্ড ও শোণিত সেই সর্ব্বসংহারক প্রচণ্ড পাবককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল। মহর্ষির সর্ব্বাবয়ব ভস্মাকারে পরিণত হইতে চলিল। এই বার সমস্ত আপদের শান্তি হইবে. লোকে বুঝিল। কিন্তু সকলই নিরর্থক; কিছুতেই কিছু হইল না,—কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। ছিন্ন অবয়ব সমূহ ভস্মাকারে পরিণত করিতে প্রচণ্ড হুতাশনের

সাহস হইল না—উহা কিছুতেই পুড়িল না। অধিকন্তু হিতে বিপরীত!—সেই শব্দ,—সেই নিষিদ্ধ শব্দ প্রসারিত হইয়া গেল। "আনাল্ হক্" ধ্বনি অনলরাশি হইতেও ঘন ঘন উত্থিত হইতে লাগিল। কি জ্বালা! এত করিয়াও এ বিপদের নিরাকরণ নাই!—দেখিয়া সকলের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, হতাশে হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাদের প্রতি কেশ-রন্ধ্র হইতে যেন অনল-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তখন তাহারা ভীষণ রোষপরবশ হইয়া যাবতীয় মাংস দেশান্তরিত করণার্থ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। উহা "আনাল্ হক্" শব্দে সৈকতভূমি কাঁপাইয়া, বারি-রাশি মাতাইয়া স্রোতো-বেগে অকুল পাথারে ভাসমান হইল। পাঠক! এক্ষণে বলুন দেখি, এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ কে? উত্তর—নিয়তি-লিপি। নিয়তিলিপি অবিচল—অনিবার্য্য। সে লিপির লিখন খণ্ডন করিতে কাহার সাধ্য নাই। এক দিন বিধাতা পুরুষ অদৃষ্ট-ফলকে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন,—প্রস্তরাঙ্কিত-বৎ জ্বলদক্ষরে আঁকিয়া দিয়াছেন, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে—বিন্দু পরিমাণে তাহার "নড়চড়" হইবার নহে। প্রচণ্ড বিক্রম সসাগরা ধরার সার্ব্বভৌম নরপতি, ও দীনহীন নিরাশ্রয় পথের ভিখারী, পরম-ধার্ম্মিক নিত্য জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষ, ও পরস্বাপহারী সদা কদাচারী দস্যু; অগাধ মনীষাসম্পন্ন

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও নিতান্ত অর্ব্বাচীন নিরক্ষর মূর্খ; দিব্য-লাবণ্য-পরিশোভিত বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ, ও চলচ্ছক্তিবিরহিত লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ, নবযৌবন-গৌরবিণী রূপবতী কামিনী ও যৌবনবিগতা পলিতকেশা প্রবীণা, পবিত্রতা-স্নাত-হৃদয় প্রিয়-দর্শন বালক ও উদ্গতোন্মুখী সুকুমারী বালিকা, সকলেই নিয়তির অধীন,—সকলেই সুখে দুঃখে নিয়ত নিয়তির পূজা করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, বিশ্বসংসারে নিয়তির সীমা অতিক্রম করিতে কেহই সক্ষম নহেন। আজ সেই প্রবল নিয়তিচক্রে নিপতিত হইয়া ঋষিরাজ মনসুরও আপনার জীবন ও গৌরব-গুরুত্ব বিসর্জ্জন করিলেন।

উপসংহার।

সাগরের সীমা নাই; সাগর অসীম, অনন্ত, অতলস্পর্শ ও সুদূর প্রসারিত। পবিত্র মাংসখণ্ড সমূহ স্রোতের আকর্ষণে এই অনন্ত সাগরে আসিয়া পতিত ও বিলুপ্ত হইবে বলিয়া সরিৎ-সলিলে নিক্ষিপ্ত হইল। লোকে ভাবিল, এই বার এই অলৌকিক অভিনয়ের যবনিকা পতন হইল, চিন্তার অবসান হইল। কিন্তু আরও কি বিস্ময়কর কাণ্ড। ঋষি-রাজের স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত দেহাংশ সকল সরিৎসলিলে নিক্ষেপ করিবামাত্র জলরাশি প্রবল তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং লোকদিগকে আক্রমণ করণার্থ কূলাভিমুখে দ্রুত ধাবিত হইল; বেলাভূমি প্লাবিত করিয়া,—ভাসমান জল-যানাদি বিপর্য্যস্ত করিয়া উপকূলস্থ ব্যক্তিবৃন্দকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কি ভীষণ দৈব বিড়ম্বনা! তখন সকলেই আসন্ন বিপদে রক্ষা পাইবার জন্য পলায়মানোদ্যত হইল,—যে যে দিকে পারিল, প্রাণ লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। স্রোতের প্রচণ্ড আঘাত অনেককেই সহ্য করিতে হইল। কত জন নিমজ্জিত, কত জন ভূপতিত ও কর্দ্দ-মাক্ত হইল, কেহ কেহ বা অন্য কাহারও বস্ত্র বা হস্তাদি

ধারণ করতঃ প্রাণরক্ষায় চেষ্টিত হইল। "পলাও পলাও" ভয়ানক কোলাহলের সহ জলোচ্ছ্বাসের অগ্রে মানব-স্রোত বহিয়া চলিল।

এদিকে মহর্ষির জনৈক প্রিয় শিষ্য এই ভীষণ ঘটনায় শান্তি স্থাপন মানসে শশব্যস্তে ধাবমান হইয়া সেই স্থলে উপনীত হইলেন। মহর্ষি একদা জীবনকালে এই শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "আমার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহের মাংসখণ্ড সমূহ নদীতে নিক্ষেপ করিলে যখন বারি-রাশি স্ফীত হইয়া লোক-দিগের অনিষ্ট কামনায় প্রধাবিত হইবে, তখন তুমি আমার নির্দ্দিষ্ট জীর্ণ পরিধেয় বৈরাগ্যবস্ত্র আনয়ন করতঃ অবিলম্বে জলোপরি নিক্ষেপ করিবে; তাহাতে ক্রোধোচ্ছ্বাসিত অম্বুরাশি অবনত ও শান্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবে, এবং সমবেত ব্যক্তিবর্গও অনিষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন।" মহর্ষির জীবনকালের এই উপদেশানুসারে তদীয় প্রিয়শিষ্য সেই পবিত্র পুরুষের পবিত্র অঙ্গাচ্ছাদনী বিস্তৃত করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে উত্তাল তরঙ্গমালার উপরিভাগে নিক্ষেপ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! অমনি উচ্ছ্বাস-উদ্ধত জলরাশি প্রশান্তভাবে নিস্তব্ধতা অবলম্বনে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নৈসর্গিক অবস্থায় অবস্থিত হইল—যেন উর্দ্ধোত্থিত অনল-শিখায় বারি-বর্ষণ, ক্রোধোদ্দীপ্ত বিস্তৃতফণ অহিরাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করিল।

পাঠক! ইহা মহর্ষির মাহাত্ম্যের পরিচায়ক নহে কি? তাঁহার অকৃত্রিম ঈশ্বর-সাধনার জাজ্বল্যমান প্রমাণ নহে কি? লোক-সাধারণে বিপদমুক্ত হইয়া স্থিরচিত্তে এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় ভাবিয়া তাহা বুঝিল এবং একেবারে চমৎকার-রসে অভিষিক্ত হইয়া গেল। ঘটনার অলৌকিকত্বে সকলের অন্তরে বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হইল। কেহ হাস্যমুখে, কেহ চিন্তা-ভারাবনত অন্তরে, কেহ বা প্রকাশ্য অনুশোচনার সহিত স্ব স্ব ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিল। বোগ্‌দাদ নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে দিবারজনী এই প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।

অনন্তর মহর্ষির শিষ্যবর্গ সমবেত হইয়া, ব্যথিত অন্তরে জলমধ্য হইতে অস্থিমাংস সংগ্রহ করিলেন এবং শাস্ত্র-সঙ্গত বিধানানুসারে সমাধি প্রদান করিলেন। হায়! এইরূপে এক জন অসাধারণ ঐশিক তেজোবীর্য্যশালী, অমানুষিক জ্ঞান-সম্পন্ন, অতুলনীয় তত্ত্বদর্শী, অলৌকিক কার্য্যক্ষম ও নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ মহাপুরুষের পবিত্র জীবনাভিনয়ের যবনিকা পতন হইল।
